ভেতরে

পার্টির সংকল্প দিবসে সভা কলকাতায় ... ২
এ আই সি সি টি ইউ-র ৭ম রাজ্য সম্মেলন ... ৩
নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ ... ৪
অনির্বাণ জ্যোতির এক বছর ৫
অভি দত্ত মজুমদার ... প্রেরণা হয়ে থাকবেন ... ৬
সুবিচার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ঃ ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২০ সংখ্যা ৪৫ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩

শাসক বাহিনীর আক্রমণের মোকাবিলা করে

বর্ধমান জেলায় কৃষিমজুরদের আন্দোলন এগিয়ে চলেছে

বর্তমান আমন ধান কাটার মরশুমে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি ১৯৩ টাকা হওয়া সত্ত্বেও এখনও কোথাও ধান কাটা, আলু চাষ ও পেঁয়াজ চাষে ন্যূনতম মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। অথচ দ্রব্যমূল্য প্রতিদিন অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। কৃষিমজুরদের জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতি কর্তৃক সর্বভারতীয় কর্মসূচী ১৫ থেকে ২২ নভেম্বর প্রচার সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে তথা বর্ধমানে ন্যূনতম মজুরি ১৯৩ টাকা কার্যকরি করার দাবি তোলা হয়। তারপর গত ২ ডিসেম্বর মেমারী ২ নং ব্লকের রানীহাটি গ্রামে মজুরি ধর্মঘট ডাকা হয়। ধর্মঘট বিরোধীতায় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধান সহ তৃণমূল বাহিনী মাঠে নামে, ধর্মঘট ভাঙ্গার চেষ্টা করে। কিন্তু কৃষিমজুরদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধে ধর্মঘট সফল হয়। এই গ্রামেই বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি আই (এম এল) প্রার্থী জয়লাভ করে। তারপর মালিকদের সাথে আলোচনা করেই ১২৫ টাকা ও ২ কেজি চাল মজুরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই গ্রামের মজুরি আন্দোলনের সফলতার পর পাশাপাশি গ্রামগুলোতেও মজুরি বেড়ে যায়। এলাকার সি পি এম নেতা-কর্মীরা এই আন্দোলনে নীরব ভূমিকা পালন করে। ফলে গরিব মানুষের মধ্যে সি পি আই (এম এল)-এর প্রভাব বাড়ছে।

৬ ডিসেম্বর কালনা ২ নং ব্লকের অকালপৌষ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকড়ে, আগ্রাদহ, বাজিতপুর ও ওমরপুর গ্রামের মজুররা সারা ভারত কৃষিমজুর সমিতি এবং সি পি আই (এম এল)-এর নেতৃত্বে ন্যূনতম মজুরির দাবিতে প্রতীক ধর্মঘট করে। ৮ ডিসেম্বর এলাকায় ১০০ লোকের মিছিল করে। ১০ ডিসেম্বর আবার ১৫০ জনের মিছিল হয় এবং মালিকদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান রাখে। কিছু মালিক অংশগ্রহণ করলেও বাকীরা তৃণমূলের প্ররোচনায় আলোচনায় আসেনি। তখন মজুর ও মালিকদের উপস্থিতিতে বর্তমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও কৃষি সংকট বিবেচনা করে আলোচনায় ঠিক হয় ১২৫ টাকা ও ২ কেজি চাল মজুরি দিতে হবে। যেহেতু সমস্ত মালিক উপস্থিত ছিল না, তাই ঠিক হয় ১১ ডিসেম্বর থেকে যারা এই নতুন মজুরিতে রাজী থাকবে তাদের জমিতে মজুররা কাজ করতে যাবে, নতুবা যাবে না। সেইমত সকাল থেকে মালিকরা নতুন মজুরি মেনে নিয়ে কাজে নিতে থাকে। বেশিরভাগ মজুর কাজে চলে যাচ্ছে, এই সময় হঠাৎ তৃণমূলের বাহিনী এসে মালিকদের হুমকি দিতে থাকে এই নতুন মজুরি মেনে নেওয়া চলবে না। মজুরদের হুমকি দিয়ে শাসাতে থাকে যদি কম মজুরিতে কাজে না যায় তাহলে ১০০ দিনের কাজ ও অন্যান্য পঞ্চায়েতের অনুদান দেওয়া হবে না। তাতেও যখন কাজ হচ্ছে না, তখন তারা চায়ের দোকানে উপস্থিত থাকা মজুর এবং সি পি আই (এম এল) কর্মীদের ওপর আক্রমণ করে, মারধোর শুরু করে। তখন বাধ্য হয়ে সমস্ত মজুররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায়। তাতে তৃণমূল বাহিনী পালিয়ে যায় এবং তাদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, ও নকশালরা তাদের মারছে এই বলে পুলিশ নিয়ে আসে। যখন পুলিশের সামনে কৃষিমজুর মহিলা সহ ঐক্যবদ্ধভাবে অভিযোগ জানাতে থাকে, তখন তারা পুলিশের সামনে সি পি আই (এম এল) নেতাদের গ্রেপ্তারে দাবি করতে থাকে। এবং বার বার জনগণের ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু প্রতিবারই গরিব জনগণের প্রতিরোধের সামনে পিছু হঠে। তারপর পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী দিয়ে মজুরদের ওপর সন্ত্রাস নামায়, ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে, সি পি আই (এম এল) লোকাল সম্পাদক হাফিজুর রহমান সহ বহু কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এতকিছু করেও মজুরদের ঐক্য দমিয়ে দিতে পারেনি। যারা ১২৫ টাকা ও ২ কেজি চাল মেনে নিয়েছে তাদের জমিতে কাজ হচ্ছে। বাকীরাও ধীরে ধীরে মেনে নিতে শুরু করেছে।

বিডিও বলছেন কোন দায়িত্ব নিতে পারবেন না। পুলিশের কর্তারা বলছেন মজুরির প্রশ্নে তারা কিছু বলতে পারবে না, শুধু আইন-শৃঙ্খলা দেখার নামে আন্দোলনকারী মজুরদের দমন করছে। তৃণমূল নেতারা মজুরি বৃদ্ধি ঠেকানোর জন্য বাহিনী নামাচ্ছে। আসলে এই সরকার পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে কৃষিমজুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে। তৃণমূল নেতারা ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মজুরদের আন্দোলনে বিরোধিতা শুরু করেছে। হাজার হাজার কৃষিমজুরকে তাদের একটু টুকরো জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে। তারা তাদের মর্জিমত মজুরি দিতে চাইছে। বিরোধিতা করলেই সন্ত্রাস নামাচ্ছে। গত বর্ষার মরশুমেও বর্ধমান জেলায় বিভিন্ন ব্লকে মজুরি আন্দোলনকারীদের ওপর সন্ত্রাস নামিয়েছে। মালিকদের সংগঠিত করে মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিডিও অফিস ভাঙ্চুর করেছে, রাস্তা অবরোধ করেছে। একজন আন্দোলনকারী মজুরকে খুনও করেছে। কালনা এস ডি ও অফিসে সর্বদলীয় মিটিংয়েও মজুরি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গলাবাজি করেছে। এইভাবে তারা গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলোর প্রতিনিধিত্ব

দুয়ের পাতায় দেখুন

নারীর নির্ভয় স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনের বর্ষপূর্তিতে

কলেজস্ট্রীটে ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের সভা

১৬ ডিসেম্বর ২০১২ দামিনী ধর্ষণকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লী ও গোটা দেশজুড়ে আমরা গণঅভ্যুত্থানের শরিক হয়েছিলাম, এরই চাপের মুখে পড়ে প্রশাসন বাধ্য হয়েছিল আইন পরিবর্তনের ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি বিধানে। ২০১৩-এর ১৬ ডিসেম্বরের এই দিনটিকে মনে করে পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে একগুচ্ছ দাবি নিয়ে আইসা, আইপোয়া, আর ওয়াই এ কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের সামনে সারাদিনব্যাপী গণঅবস্থান আয়োজন করেছিল। দাবি হিসাবে উঠে এসেছিল—'পশ্চিমবঙ্গের নির্ভয়া' কামদুনি ধর্ষণ কাণ্ডের নির্যাতিতার অবিলম্বে বিচার চাই, সারদা কাণ্ডের সি বি আই তদন্তের, সুপ্রীম কোর্টের ৩৭৭ ধারা আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করার দাবি।

বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, আইসার পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক দেবমাল্য হালদার ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট থেকে সুধন্যা পাল, আইপোয়ার পক্ষ থেকে চন্দ্রাস্মীকা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। 'ড্রামেবাজ' নাট্যগোষ্ঠী একটি পথ নাটিকা প্রদর্শন করে। কবিতা ও গানে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে গণঅবস্থান। 'গণ সংস্কৃতি পরিষদ'-এর পক্ষ থেকে নীতীশ রায়, আইসার

কফি হাউসের সামনে আজও প্রতিবাদ বেঁচে আছে—১৬ ডিসেম্বর '১৩-র প্রতিবাদ চলছে

পক্ষ থেকে জয়মাল্য, প্রতীক, পলাশ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। শ্লোগানে উঠে আসে—"কামদুনির বিচার চাই", "৩৭৭ মানছি না মানব না", "বেখৌফ আজাদী জিন্দাবাদ"।

গুরুদাস কলেজে আইসা'র ছাত্র নেতার উপর টি এম সি গুন্ডাদের আক্রমণ

কলকাতার গুরুদাস কলেজে গত ১৯ ডিসেম্বর আইসা (এ আই এস এ)-র ছাত্র নেতা প্রতীক সেনগুপ্তকে টি এম সি পি-র গুন্ডারা ঘিরে ধরে মারে। এর প্রতিবাদে আইসা-র তরফে আক্রমণকারিদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করা হয়েছে। সাথে সাথে কলেজ স্ট্রীট এলাকায় ধিক্কার মিছিল বের করা হয়। মিছিল থেকে দাবি ওঠে, হামলাকারিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে। ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে আহ্বান রাখা হয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টি এম সি পি-র হামলাবাজী, গুন্ডাবাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও! মিছিলে নেতৃত্ব দেন আইসা-র কলকাতা জেলা সম্পাদক দেবমাল্য সহ অন্যান্য ছাত্রনেতারা, মিছিলে ছিলেন এ আই সি সি টি ইউ-র কলকাতা শাখার অন্যতম নেতা দ্বৈপায়ন। সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ ও কলকাতা জেলা সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী আইসা নেতা প্রতীকের উপর তৃণমূল 'ছাত্র পরিষদের' এই দাদাগিরি ও হামলার জন্য যারা দায়ি তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছেন। আইসা-র প্রতিরোধ চলছে, চলবে।

সম্পাদকীয়

‘দাতব্য’ নয়, চলছে শোষণ-বঞ্চনা-দুর্নীতি

সদ্য সমাপ্ত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি এবং অদূরেই পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন—এই দুইয়ের চাপে পড়ে কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বোধহয় ভেবে কূল পাচ্ছে না কীভাবে সুলভে ভাবমূর্তির ম্যাজিক পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। যাইই ‘নতুন’ কিছু করতে যাচ্ছে তা ব্যুমেরাং হচ্ছে। যেমন ‘‘দাগীদের’’ ‘জনপ্রতিনিধি’ হওয়ার সংস্থান রদ না করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী যে অর্ডিনান্স এনেছিলেন সেটা আবার কংগ্রেস-যুবরাজের প্রকাশ্য আপত্তির মুখে অনতিবিলম্বে প্রত্যাহৃত হয়েছিল বিগত বিধানসভা নির্বাচনগুলোর প্রাক-পরিস্থিতিতে। তা সত্ত্বেও নির্বাচনে কংগ্রেসের মুখ পুড়েছে। তারপরে যেমন গ্যাস-ভর্তুকি পাওয়ার সাথে গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ‘ক্যাস-ট্রান্সফার’ বা নগদ হস্তান্তর প্রকল্প নামানো হয়েছে এবং তার সাথে পূর্বশর্ত হিসেবে ‘আধার কার্ড’ জমা দেওয়ার ফতোয়া চাপানো হয়েছে, কিন্তু আধার কার্ড তৈরী ও বিলিবণ্টন প্রকল্পই যেখানে অনিশ্চয়তা-প্রবঞ্চনার আঁধারে, এ নিয়ে জনমানসে ক্ষোভ-বিক্ষোভ তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই।

এখন আবার এক নিদান জারী করতে শোনা গেল কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশকে। তিনি ইউ পি এ সরকারের গৃহীত অবস্থান স্পষ্ট করতে বললেন, ১০০ দিনের কাজের মজুরি কোন ‘দাতব্য’ বা নগদ হস্তান্তর নয়, কাজের বহর দেখেই মজুরি দেওয়া হবে। তিনি আরও বললেন, ‘কারও নাম করব না। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে, বহু রাজ্যে শ্রমিকদের কাজ না দিয়ে উপস্থিতির ভিত্তিতে মজুরি দেওয়া হচ্ছে।’

জয়রামের এই সমস্ত কথায় ভিত্তিতে পাল্টা প্রশ্ন উঠেই আসে যে, তিনি কোনও রাজ্যের নাম উল্লেখ না করে, অভিজ্ঞতার নির্দিষ্ট তথ্যসূত্র প্রকাশ না করে একদিকে অসততা করছেন, অন্যদিকে প্রকৃত তথ্যকে লুকোচ্ছেন। আর এহেন শঠতার ওপর দাঁড়িয়ে ‘সদাশয়’ নাম কিনতে চাইছেন। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ না করে, স্রেফ হাজিরা দিয়ে মজুরি পাওয়ার কোন গল্প কেউ শোনাতে পারবে না। এরাজ্যে বিগত বামফ্রন্ট আমলে এই প্রকল্পে বছরকার গড়ে কাজ পাওয়ার সর্বশেষ তথ্যচিত্র ছিল ১৮-২০ দিনের। সেখান থেকে তৃণমূল জমানার প্রথমবর্ষে (’১১-’১২) কিঞ্চিৎ বেড়ে হয়েছিল বছরে গড়ে ২৫ দিন, তারপর চলতি বর্ষে (’১২-’১৩) তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে আরেকটু—গড়ে ৩৫ দিন। দাবি যেখানে সারা বছর কাজ পাওয়ার, প্রকল্প সেখানে বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময়ের, তারপরে কাজ জুটছে ঘোষিত মোট দিবসের এক-তৃতীয়াংশ দিনের। এই অভিজ্ঞতায় ‘দাতব্য’ করার তথ্য কোথায়? বরং বিপরীতে দুটো তথ্যের তিক্ত অভিজ্ঞতা মজুরদের রয়েছে। প্রথমত, মজুরদের কাজ পাওয়া নিয়ে অনেক সময় হন্যে হতে হয়, মজুরির তুলনায় বেশী মেহনত করিয়ে নেওয়া হয়, বিশেষত মহিলা মজুরদের কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি করা হয়; দ্বিতীয়ত, মাত্রাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত শ্রমের আর্থিক মূল্য আত্মসাৎ করা হয় কর্মপ্রাপকের তালিকায় ভুয়ো সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়ে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কার্যত যা চালানো হয় সেটা মজুরি শোষণ, বঞ্চনা ও দুর্নীতি। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে চলা দুর্নীতির বিষয়টি কি করে আর নিজ মুখে সামনে আনবেন! ইউ পি এ-র বকলমে কংগ্রেস জোটের রাজত্ব দু’পর্বে যে হারে কোটি কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে কলঙ্কিত হয়েছে, তার পরিচালক মন্ত্রী ও নেতারা এন আর ই জি এ খাতে দুর্নীতির প্রসঙ্গ তোলেন তাহলে নিজেরাও যে জেরবার হবেন! জয়রাম তাই ও প্রসঙ্গে মুখ খোলেননি। আর বেকারভাতা দেওয়ার গল্প কেন্দ্র-রাজ্যের মালিকদের কাছ থেকে শুনে শুনে মজুররা তিতিবিরক্ত।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এতদিনে বলছেন, ১০০ দিনের কর্মপ্রকল্পকে বিশেষত গ্রামীণ স্থায়ী সম্পদ নির্মাণের পরিকল্পনার সাথে যুক্ত করার কথা। যেমন ইন্দিরা আবাস যোজনায় গৃহনির্মাণ, স্বনির্ভর মহিলা গোষ্ঠীর সংগঠনের জন্য গৃহনির্মাণ, পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে ইটভাটা তৈরী, কৃষিপণ্যের গুদামঘর, সড়ক নির্মাণ ইত্যাদি স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির জন্য। কিন্তু এসব কোন নতুন কথা নয়। এই সমস্ত দাবি সংগ্রামী কৃষিমজুর ও কৃষক সংগঠনসমূহ এবং পঞ্চায়েতে গরিব জনতার প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারি জনপ্রতিনিধিরা দীর্ঘদিন যাবত লাগাতার ডেপুটেশন-স্মারকলিপি-সংগ্রাম ও সমাবেশের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে ওয়াকিবহাল করে আসছে। সামনে লোকসভা নির্বাচন, তাই কেন্দ্রের কংগ্রেসী মন্ত্রী খুব স্তোকবাক্য শোনাচ্ছেন। দাবির মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ভূপৃষ্ঠের বড় বড় সেচ খনন, জলাধার নির্মাণ এবং ক্ষেতের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরি হওয়া দরকার। অথচ যেটা সবচেয়ে বেশী অবহেলার শিকার এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রদানের তালিকায় রাখা হয়নি। এর পেছনে গূঢ় কারণটি হল পুঁজিবাদী ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে বহুজাতিক কোম্পানী ব্যবসার অনুপ্রবেশকে ছেয়ে যেতে দেওয়ার গৃহীত পলিসি। এই কারণেই প্রসঙ্গটির উল্লেখ কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর মুখে এল না।

জয়রামজী যখন নতুন করে ১০০ দিনের কাজের মজুরি-লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের হিসাব নিকাশ নিয়ে সরব হচ্ছেন—যা কংগ্রেসেরই পরিকল্পনাপ্রসূত। অন্যদিকে গ্রামীণ ভারতের ক্ষেতমজুর জনতাও কংগ্রেস ও তার কেন্দ্রের ইউ পি এ জমানার হিসাব নিকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে, যার একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হল ঐ ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্র।

ধনেখালিতে ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে তৃণমূলী হামলার তীব্র নিন্দা

৯ ডিসেম্বর সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন—

(১) গত ৮ ডিসেম্বর হুগলী জেলার ধনেখালির মনসাতলায় ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে ওই দলের নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী নরেন দে, প্রাক্তন বিধায়ক অজিত পাত্র ও অঞ্জন সিংহ রায়-এর ওপর সশস্ত্র হামলা চালালো একদল তৃণমূল দুষ্কৃতি। গুরুতর আহত অবস্থায় নরেন দে ও অজিত পাত্রকে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ’৭০-এর দশকে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের জমানায় যেভাবে পার্টি অফিস, জনসভা, এবং এলাকাগুলোতে বাম ও গণতান্ত্রিক কর্মীদের ওপর পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে সশস্ত্র দুষ্কৃতিরা হামলা চালাতো সেই একই কায়দায় ধনেখালিতে তৃণমূলী দুষ্কৃতিরা হামলা চালালো। এলাকার মানুষের অভিমত, তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নাসিরুদ্দিন হত্যা মামলায় অভিযুক্ত স্থানীয় বিধায়ক অসীমা পাত্র এই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং তারই মদতে অপরাধীরা হামলা চালিয়েছে। আমরা এই ঘটনার

তিনের পাতায় দেখুন

পার্টির সংকল্প দিবসে সভা কলকাতায়

গণভিত বাড়িয়ে তোলার আহ্বান জানালেন নেতৃবৃন্দ

বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করেছে, সংগ্রামী বামপন্থী শক্তির কাছে একে মোকাবিলা করার অর্থ হল নিজস্ব গণভিতকে বাড়িয়ে তোলা। ১৮ ডিসেম্বর সংকল্প সভায় এই আহ্বান জানালেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কার্তিক পাল। কমরেড বিনোদ মিশ্রের ১৫তম ও কমরেড শংকর মিত্রের প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে কলকাতায় বি ই এম পি ইউ হলে এই সংকল্প সভার আয়োজন করে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কলকাতা জেলা কমিটি। অংশগ্রহণ করেন জেলার পার্টি কর্মীরা, রাজ্যের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ, দেশব্রতী ও রাজ্য অফিসের সাথে যুক্ত পার্টি কর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন শংকর মিত্রের স্ত্রী আনু মিত্র প্রমুখ। সংকল্প সভার শুরুতে নীরবতা পালন করে প্রয়াত নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রথম বক্তা কার্তিক পাল বলেন, আজকের সংকল্প সভার তাৎপর্য হল সমগ্র পার্টিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা শ্রেণী ও স্তরের মানুষদের সংগঠিত করার জন্য বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে তুলেছি। পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ পার্টি স্পিরিটকে শক্তিশালী করার সংকল্প আজ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। পরিস্থিতির নতুন নতুন বিকাশ ঘটছে, জনগণের আন্দোলনের মধ্য থেকে নতুন দিকগুলো উঠে আসছে। অনেক কিছুই আগে থেকে বোঝা যায় না, ঘটনা ঘটার পর আমাদের তা থেকে শিক্ষা নিতে হয়। সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীর বুকে যে অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে দুর্নীতি, মহিলা নির্যাতন ও নানা ইস্যুতে তা গণবিস্ফোরণের আকারে ফেটে পড়েছে। প্রতিষ্ঠিত শাসকদলগুলো প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে। যেখানে নতুন প্রজন্ম সংগ্রামী বামপন্থী শক্তিকে বিপুলভাবে সমর্থন দেয়। এরপরেই দেখা গেল দিল্লীর বিধানসভা নির্বাচনে ‘আপ’ অভূতপূর্ব সাফল্য পেল। পরিস্থিতির এই বিকাশ নতুন নতুন প্রশ্ন সামনে তুলে ধরছে, যাকে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

দ্বিতীয় বক্তা পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড পার্থ ঘোষ বলেন, একইদিনে দু-জন বিশিষ্ট নেতার প্রয়াণ দিবস কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। কমরেড বিনোদ মিশ্র এবং শংকর মিত্র দু-জনেই ছিলেন অসম সাহসী। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে বিপ্লবী সংগ্রামের ধাক্কা ও পশ্চাদপসারণের পর্যায়ে তাঁরা সাহসী পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে পার্টির জীবনশক্তিকে ফিরিয়ে আনার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ছকে বাঁধা পথে না হেঁটে নতুন পথের উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকের দিনে সংকল্প নিতে হবে, আমাদের ছকে বাঁধা জীবনধারা ও কাজের রীতি ভাঙ্গতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান প্রধান বিপদ হয়ে উঠেছে। কর্পোরেট পুঁজি একে প্রবল সমর্থন দিচ্ছে। নিছক ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান দিয়ে একে মোকাবিলা করা যাবে না—এর সাথে অর্থনৈতিক নীতিমালার দিক যুক্ত করতে হবে। আমরা যখন হিন্দী বলয়ের কেন্দ্র পাটনার বুকে ফ্যাসিস্ট শক্তির দাঙ্গা লাগানোর চক্রান্ত মোকাবিলা করে ‘‘খবরদার র‍্যালি’’র চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম, তখন মেকী বামপন্থীরা ফ্যাসিস্টদেরই পুরানো সহযোগিদের সাথে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তিকারী নেতাদের সাথে নিয়ে রাজধানী দিল্লীতে তথাকথিত ‘ধর্মনিরপেক্ষ জোট’ তৈরী করার কসরৎ দেখালো। সম্প্রতি দিল্লীর বুকে আপ-এর উত্থান নিয়ে চর্চা করা প্রয়োজন, তবে এই পরিঘটনা বিজেপির নেতিকরণ হিসাবেই ঘটেছে। দেখা গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ছাত্র, যুব, মহিলাদের অরাজনৈতিক ও আন্দোলন বিমুখ বলে যে প্রচার করা হয় তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নারীর নির্ভয় স্বাধীনতার দাবি আজ সমগ্র সমাজের দাবি হয়ে উঠেছে। দেরিতে হলেও সমাজের উচ্চাসনে থাকা ব্যক্তিদের অপকীর্তির বিরুদ্ধে মহিলারা আজ রুখে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করছেন, সংবিধানের ৩৭৭ ধারা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে, সমকামিতার অধিকারের সপক্ষে জোরালো প্রতিবাদ গড়ে উঠছে।

সর্বশেষ বক্তা পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড ধুর্জটি প্রসাদ বক্সী সংকল্প সভার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন, আমাদের সংকল্পকে নবীকরণ করতে হয় সমকালীন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করার লক্ষ্যে। কমরেড বিনোদ মিশ্র ধাক্কার পরিস্থিতিতে পার্টিকে সমস্ত দিক থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কমরেড শংকর মিত্র ছিলেন সেই প্রক্রিয়ায় অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বিপ্লববাদ ও সুবিধাবাদের পার্থক্য সম্পর্কে কমরেড বিনোদ মিশ্রের তাত্ত্বিক সূত্রায়নের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যবর্তী পর্যায়ে প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে সমঝোতা ও সংগ্রামের এক দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। সুবিধাবাদীরা যেখানে রাষ্ট্রের সাথে সমঝোতা করে চুক্তিবদ্ধ হয়, বিপ্লববাদীরা বিপরীতে অনন্যোপায় হয়ে শেষ উপায় (অপশন) হিসাবে কখনও কখনও সমঝোতা করে থাকে। আমাদের পার্টির কৌশলগত লাইনের তিনটি মৌলিক উপাদান—নীচুতলায় জঙ্গী কৃষক সংগ্রাম, উপরিস্তরে রাজনৈতিক প্রচার অভিযান ও পার্টি গঠন, এই প্রক্রিয়াটিকে আমাদের অনুশীলনে মূর্ত করে তুলতে হবে। ‘আপ’-এর উত্থান সম্পর্কে তিনি বলেন, একে বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে অতি সরলীকরণ করা উচিৎ নয়; কোন পরিস্থিতিতে এই শক্তি গড়ে উঠলো—তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। এটা কোন র‍্যাডিক্যাল শক্তি নয়, বামপন্থী ও নয়া, আবার একে শাসক দলের পার্টিও বলা চলে না। কিছুদিন আগে ‘সেজ’ আইন যখন পার্লামেন্টে পাশ হল তখন কোন রাজনৈতিক দলই তার বিরোধিতা করেনি কিন্তু পরবর্তীতে আক্রান্ত মানুষই একে প্রতিরোধ করেছে। এটাই আমাদের বিকাশের বস্তুগত শর্ত দেখিয়ে দিচ্ছে। দিল্লীর বুকেও দেখা গেল, কংগ্রেস ও বিজেপির বাইরে তৃতীয় শক্তির একটা পরিসর রয়েছে।

সংকল্প সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সুব্রত ভট্টাচার্য। ছাত্র সংগঠক প্রতীকের গান সভাকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সভা সঞ্চালনা করেন পার্টির কলকাতা জেলা সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী।

... আন্দোলন এগিয়ে চলেছে

একের পাতার পর

করার মাধ্যমে নিজেদের একছত্র ক্ষমতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেষ্টা করছে। আর অধঃপতিত সি পি এম নেতারা এখন শামুকের খোলের মধ্যে সময়ের অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে।

তাই বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে গরিব জনগণের জীবন-জীবিকা ও মজুরির অধিকার রক্ষা করার জন্য তৃণমূলের চোখ রাঙানোকে মোকাবিলা করেই এগিয়ে যেতে হবে। আর এই ঐতিহাসিক দায়িত্বটি পড়েছে সি পি আই (এম এল) তথা সংগ্রামী বামপন্থী কর্মী-নেতাদের ওপর।

- সজল পাল

সফল হল এ আই সি সি টি ইউ-র সপ্তম রাজ্য সম্মেলন

উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সমাপ্ত হল এ আই সি সি টি ইউ-র সপ্তম রাজ্য সম্মেলন। কলকাতায় বিভাস বোস সভাগৃহে (সুকান্ত মঞ্চ), ১৭ ডিসেম্বর ২০১৩ এই সম্মেলন শুরু হয় ঠিক সকাল ১০টায়, রক্ত রঞ্জিত লাল পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এ আই সি সি টি ইউ-র কেন্দ্রীয় নেতা ও সম্মেলনের পর্যবেক্ষক এস কে শর্মা সর্বপ্রথম লাল পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, পলিটব্যুরো সদস্যবৃন্দ কার্তিক পাল ও ধূর্জটি প্রসাদ বক্সী, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অভিজিৎ মজুমদার সহ এ আই সি সি টি ইউ-র নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সেক্টর ও ফেডারেশন এবং ভ্রাতৃপ্রতিম গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। শহীদদের উদ্দেশ্যে নীরবতা পালনের মাধ্যমে রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী পর্ব শেষ হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতিক পরিষদের বাবুনী মজুমদারের গণসঙ্গীত পরিবেশনার মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্য রখেন কেন্দ্রীয় নেতা ও পর্যবেক্ষক এস কে শর্মা। তিনি বলেন, ''দুনিয়াজুড়েই পুঁজিবাদ এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে, আর সংকট থেকে পরিত্রাণ পেতে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চাপিয়ে দিতে চাইছে সাধারণ মানুষের ওপর। রং-বেরঙের নানা সরকারগুলো এই নীতিগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে। অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনে বিরাট সংকট নামিয়েছে, পাশাপাশি চলছে হরেকরকম শোষণ-উৎপীড়ন। শুধু রাজনৈতিক দলগুলো নয়, বিচার ব্যবস্থাও শ্রমিক-মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে—বিহারের গণহত্যার প্রশ্নে বিচারব্যবস্থার ভূমিকায় যা স্পষ্ট হল। বিপরীতে বাড়ছে শ্রমিক-কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলন। যার মূর্ত প্রকাশ ঘটল ২০-২১ ফেব্রুয়ারির সফল ধর্মঘটে।

শর্মাজি এরাজ্যে তৃণমূল সরকারের শ্রমিক বিরোধী ভূমিকাকেও উন্মোচিত করেন। তিনি বলেন, সরকারের ওপর মহলের দুর্নীতি ক্রমশ তার শাখা প্রশাখার বিস্তার ঘটাচ্ছে। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গড়ে ওঠা রাজ্যের কল্যাণ পর্ষদগুলোতে টাকার নয়-ছয় চলছে।

শুধু মাত্র মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে নির্মাণ শ্রমিকদের সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর আন্দোলনের পাশেও সামিল হওয়ার কথা তিনি বলেন। বিপ্লবী ধারায় এ আই সি সি টি ইউ-কে আগামী দিনে পরিচালিত করার আহ্বান রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সি পি আই (এম এল)-এর রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন যে, ''দেশে শ্রমিক আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে। দেশব্যাপী মহিলাদের ওপর উৎপীড়ন বেড়ে চলেছে। চলছে কৃষকদের আত্মহত্যা মিছিল। ক্ষেতমজুররা কাজ না পেয়ে পরিযায়ী হয়ে চলে যাচ্ছে অন্য রাজ্যে। যারা কাজ পাচ্ছেন, তাদের দেওয়া হচ্ছে না ন্যূনতম মজুরি। বেকার যুবকদের চাকরি নেই। এদিকে, কর্পোরেট ঘরানার স্বার্থে যে উদার আর্থিক নীতি চালু হয়েছে তা লাগামহীন দুর্নীতির জন্ম দিয়েছে।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক এস কে শর্মা।

লুঠ হচ্ছে দেশের সম্পদ, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা।''

তিনি আরও বলেন, ''ব্যাপক গণরোষের মুখে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এখন কর্পোরেট দুনিয়া সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ত শক্তিকে সামনে আনার তোড়জোড় চালাচ্ছে। সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে এই শক্তি উদ্যত।'' এ প্রসঙ্গে তিনি এ রাজ্যেও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ওপর নেমে আসা হামলার উল্লেখ করেন। উল্লেখ করেন উত্তর ২৪ পরগণার রন্ধন কর্মীদের সমাবেশে তৃণমূলী হামলা, কালনায় মজুরি বৃদ্ধি আন্দোলনে তৃণমূলীদের সশস্ত্র আক্রমণের উদাহরণগুলো।

এরপর বিদায়ী রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বোস। প্রতিবেদনে এ আই সি সি টি ইউ-র নতুন নতুন সম্প্রসারণের ক্ষেত্র যেমন, নির্মাণ শিল্পে, রন্ধনকর্মী, আশা কর্মীদের ওপর নেমে আসা হামলা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এ আই সি সি টি ইউ অন্তর্ভুক্ত রাজ্য ফেডারেশনের উল্লেখযোগ্য প্রথম সফল রাজ্য সমাবেশ, বন্ধ কারখানার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্য সরকার কিভাবে রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে বেসরকারিকরণের চক্রান্ত করছে। একদিকে গণপরিবহনে সরকারি অনুদানের যে সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, তার থেকে রাজ্য সরকার নিজের হাত গুটিয়ে নিচ্ছে। বঞ্চিত করা হচ্ছে পরিবহন শ্রমিকদের সমস্ত বিধিবদ্ধ প্রাপ্য থেকে। সি টি সি-কে পুনরুজ্জীবিত করার নামে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ৯০০ কাঠা প্রাইম ল্যাণ্ড বিক্রি করার জন্য। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডি এ বকেয়া রাখা হয়েছে 'অর্থাভাবে'র অজুহাতে, অথচ লক্ষ কোটি টাকা সরকার ব্যয় করছে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে, আমোদ-প্রমোদ, মেলা অনুষ্ঠান ও মোচ্ছব প্রভৃতির মাধ্যমে। অবাধে ঠিকা-ক্যাজুয়াল কর্মীদের মাধ্যমে স্থায়ী কাজ করানো হচ্ছে, ইতি টানা হয়েছে শূন্যপদে নতুন কর্মী নিয়োগে।

তৃণমূলী রাজ্য সরকার আজ এ রাজ্যে শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকেও হরণ করছে। গত ২০-২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ৪৮ ঘন্টাব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে ভাঙ্গতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী, প্রশাসন ও তৃণমূলী ট্রেড ইউনিয়ন যে বর্বর আক্রমণ নামিয়েছিল, তারও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যে ২০১২-১৩ সালে লক আউটের জন্যই স্রেফ ৯৯.৯৭ শতাংশ শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে। লক আউটই যখন প্রধানতম প্রবণতা, সেখানে লক আউটের বিরুদ্ধে সুর না চড়িয়ে, আজ পর্যন্ত একটিও লক আউটকে বেআইনি ঘোষণা না করে নগ্নভাবেই পুঁজির সপক্ষে দাঁড়িয়েছে এই সরকার।

শ্রমিকদের শিল্পভিত্তিক দাবি সনদ মীমাংসার ক্ষেত্রেও রাজ্য সরকারের ভূমিকা চূড়ান্ত নেতিবাচক। এ বছরের গোড়ায় চটশিল্পের সমস্ত ইউনিয়ন শিল্পভিত্তিক দাবি সনদ পেশ করা সত্ত্বেও তার মীমাংসার জন্য কোন কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা গেল না শ্রম দপ্তরের তরফ থেকে। বন্ধ-রুগ্ন শিল্পে শ্রমিকদের দুর্দশা বাম জমানায় যেমন ছিল, আজও তা একই জায়গায় থেকে গেছে।

এরপর বিভিন্ন সেক্টর ও ফেডারেশনগুলোর তরফ থেকে বক্তারা প্রতিবেদনের ওপর বক্তব্য রাখেন। চটকল, নির্মাণ, রেল, বিদ্যুৎ, রন্ধনকর্মী, আশা, বিড়ি, বন্ধ কারখানার শ্রমিক, পরিবহন, চা বাগিচা প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য ও অভিজ্ঞতা পেশ করে প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেন। রেল কর্মীরা জানান যে কীভাবে তারা এ সেক্টরে অগণিত কন্ট্রাক্ট শ্রমিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নিচ্ছেন। তাঁরা আরও জানান, রেলে স্ট্রাইক ব্যালট নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে এবং আগামী ২০-২১ ডিসেম্বর স্ট্রাইক নোটিশ দেওয়ার তোড়জোড় চলছে।

১৮ ডিসেম্বর সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক কর্মচারী-অফিসারদের ধর্মঘট, রেল শ্রমিকদের ধর্মঘটের প্রস্তুতি, এ বছরের শেষ সপ্তাহে বিলগ্নিকরণের বিরুদ্ধে ভারতের কয়লা শিল্পে তিন দিনের ধর্মঘটের ঘোষণা নতুন করে আন্দোলন এক বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিল। শুধুমাত্র সেক্টর বা ইউনিয়ন গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকা নয়, আসন্ন এই সমস্ত আন্দোলনে এ আই সি সি টি ইউ-র সক্রিয় উপস্থিতির অঙ্গীকার সম্মেলন মঞ্চ থেকে প্রতিধ্বনিত হয়।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলোর তুলে ধরা ১০ দফা দাবির পাশাপাশি এ রাজ্যের জন্য যে সুনির্দিষ্ট দাবি সম্মেলন থেকে করা হয়েছে তা হল ঃ

(১) বন্ধ কারখানা খোলা ও রুগ্ন শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য শিল্প দপ্তরকে বিশেষ 'সেল' গঠন করতে হবে। বন্ধ কারখানা সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য দিয়ে রাজ্য সরকারকে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। (২) বন্ধ কারখানার সমস্যা সমাধানে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে। (৩) বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের বি পি এল তালিকায় অন্তর্ভুক্তি ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'ফাউলাই'-এর ন্যূনতম ৩০০০ টাকা করতে হবে এবং সমস্ত বকেয়া না পাওয়া পর্যন্ত তা বহাল রাখতে হবে। (৪) পি এফ আত্মসাৎকারী মালিক ও দুর্নীতিগ্রস্ত ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। গ্র্যাচুইটি উদ্ধারের জন্য রাজ্য সরকারকে কঠোর প্রশাসনিক ও আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। (৫) নির্মাণ শ্রমিকদের রেজিস্ট্রিকৃত করার নিময়বিধি সহজ করে অভিন্ন পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। (৬) রন্ধন ও আশা কর্মীদের সাম্মানিক নয়, শ্রমিকদের মর্যাদা দিয়ে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি, সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় মর্যাদা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করতে হবে। (৭) সম কাজে সম বেতন চালু করতে হবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য করা চলবে না। (৮) অসংগঠিত শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য আইনকে রাজ্যে দ্রুত রুলস করে চালু করতে হবে। (৯) সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি যে সমস্ত মালিকপক্ষ কার্যকরি করছে না তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। (১০) চা বাগানে বাস্তুভিটা জমিতে চা শ্রমিকদের পাট্টা প্রদান করতে হবে।

সর্মসম্মতিক্রমে খসড়া প্রতিবেদন গৃহীত হওয়ার পর সম্মেলন থেকে ৮৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজ্য কাউন্সিল, ৩৫ জনের কার্যকরী কমিটি এবং ১৭ জনের অফিস বেয়ারার নির্বাচিত হয়। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হন অতনু চক্রবর্তী এবং বাসুদেব বোস। সম্মেলনকে পরিচালনা করার জন্য ৯ জনের সভাপতিমণ্ডলী এবং ৩ জনের স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য/সদস্যারা হলেন এন এন ব্যানার্জী, পুলক গাঙ্গুলী, বটকৃষ্ণ দাস, অমল তরফদার, বলরাম মাঝি, কাজল দত্ত, জয়শ্রী দাস, নবেন্দু দাশগুপ্ত এবং অতনু চক্রবর্তী। স্টিয়ারিং কমিটিতে ছিলেন দ্বৈপায়ন, কিশোর সরকার ও দেবব্রত ভক্ত।

বৃহত্তর সংগ্রাম ও আন্দোলনের শপথ ও প্রত্যয় নিয়ে শেষ হল সপ্তম রাজ্য সম্মেলন।

... তৃণমূলী হামলার তীব্র নিন্দা

দুয়ের পাতায় দেখুন

তীব্র নিন্দা করি এবং অবিলম্বে দুষ্কৃতিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।

(২) আজ দিল্লীতে তৃণমূলী বিধায়ক ও সাংসদরা সংসদ ভবনের বাইরে চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। বিগত দিনগুলোতে রাজ্যজুড়ে সারদা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত তৃণমূলের নেতা, নেত্রী, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদদের গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। তৃণমূলী রাজ্যসভা সাংসদ কুণাল ঘোষ খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী থেকে শুরু করে তৃণমূলের এক সারি নেতা-মন্ত্রীদের এই ঘটনায় যুক্ত থাকার কথা জানিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুনরায় দাবি জানাচ্ছি সারদা কেলেঙ্কারি সহ চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারির সি বি আই তদন্ত হোক এবং প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হোক।

(৩) উত্তরবাংলার শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটির প্রায় ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ অর্থের তছরুপ হয়েছে। চুল্লি কেলেঙ্কারি বলে যা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূলী বিধায়ক রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য, মন্ত্রী গৌতম দেব এবং এস জে ডি এ-র কার্যনির্বাহী (প্রাক্তন) গোদলা কিরণকুমারের নাম জড়িয়ে আছে। অবিলম্বে তৃণমূলী বিধায়ক রুদ্রনাথ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তারের দাবি সহ গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ উচ্চপর্যায়ের তদন্তের আমরা দাবি জানাচ্ছি।

আক্রান্ত ও আহত প্রবীণ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নরেন দে-কে দেখতে চুঁচুড়া হাসপাতালে যান সি পি আই (এম এল) চুঁচুড়া লোকাল কমিটি সম্পাদক স্বপন গুহ ও ব্যোমকেশ ব্যানার্জী সহ সি পি আই (এম এল)-এর এক প্রতিনিধিদল। স্বপন গুহ এক প্রেস বিবৃতিতে এই ঘৃণ্য আক্রমণকে ধিক্কার জানান এবং বাম ও গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সরকারি নির্দেশ
টি এম সি পি-র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামাল দেওয়ার চেষ্টা

সরকারি নির্দেশে বছর খানেক স্থগিত থাকার পরে পশ্চিমবঙ্গের কলেজে কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আবার শুরু হতে চলেছে সরকারের নির্দেশ অনুসারেই। অনেকেরই হয়তো খেয়াল আছে এই বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসের ১২ তারিখে খিদিরপুরে হরিমোহন ঘোষ কলেজে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন গুলি করে পুলিশের একজন সাব ইন্সপেক্টর তাপস চৌধুরীকে হত্যা করে শাসক দলের আশ্রিত একজন গুণ্ডা, যে আবার ঐ এলাকার বোরো চেয়ারম্যান তৃণমূলের মুন্নাভাইয়ের নির্দেশ মেনে চলে। এর পরে সেই মুন্নাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তবে তিনি জামিনে ছাড়াও পেয়ে গেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মুন্নাভাইয়ের হয়ে আদালতে সওয়াল করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উপদেষ্টা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। বোঝাই যাচ্ছে কোন ছাত্র সংগঠনের হয়ে মুন্নাভাইরা গুলিগোলা চালাতে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হরিমোহন ঘোষ কলেজে ঐ ঘটনার আগের দিন বোমা বাঁধতে গিয়ে তৃণমূল পুরপিতার ছেলে গুরুতর আহত হয় ও পরে মারা যায়। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে গণ্ডগোল প্রায় জলভাত হয়ে উঠলেও হরিমোহন ঘোষ কলেজের ঘটনা নিঃসন্দেহে অন্য মাত্রা যোগ করে। আর রোজ শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতি বন্ধ করার আওয়াজ ওঠানো সরকার তড়িঘড়ি ছাত্র সংসদের নির্বাচনই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়। তার প্রায় ৯ মাস বাদে নির্বাচন শুরু করার নির্দেশিকা জারি করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর নির্বাচন ২০১৪ সালের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সেরে ফেলতে বলেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য ছাত্র সংসদ সংক্রান্ত খসড়া বিধি প্রকাশ করে সবার কাছ থেকে মতামত চাওয়া হয়, তবে তার ফল জানা যায়নি; নতুন কোন বিধিও ঘোষিত হয়নি। ফলে কেনই বা ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ হয়েছিল, আর কেনই বা তা চালু হল তার মাথামুণ্ডু কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

ছাত্র সংসদ দখল করার জন্য বামফ্রন্ট শাসনকালে সি পি এমের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই সরকারের কাছ থেকে মদত পেত। প্রত্যক্ষ মদতের দিক থেকে কলেজগুলোতে অধ্যক্ষরা এস এফ আইকে সরাসরি সাহায্য করত। নির্বাচনের দিন ঘোষণা থেকে শুরু করে নমিনেশন ফর্ম তোলা, জমা দেওয়া, স্ক্রুটিনি সবই করা হত ঐ সংগঠনের ছাত্র নেতাদের সুবিধে অনুযায়ী। আর তা এমনভাবেই করা হত যাতে অন্য কোন সংগঠন আবদেন জমাই না দিতে পারে। ফলে অধিকাংশ কলেজেই এস এফ আই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব আসনেই জয়ী হত। এর পরে কলেজ কোন গণ্ডগোলই হত না, কোন আন্দোলনও হত না। কলেজ কর্তৃপক্ষ এস এফ আই-এর সঙ্গে আলোচনা করেই কলেজের বেতন বাড়াতো, অন্যান্য ফিজ চাপাতো। ঐ টাকার একটা অংশ ছাত্র সংসদের নামে নেতারা নিয়ন্ত্রণ করত। কলেজ সোশ্যাল, নবীন বরণ, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এইসবের নামে যা টাকা নেওয়া হত তার তেমন কোন হিসেব মিলত না। কলেজগুলোতে ক্লাস না হওয়া, অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি, মাথা ভারী অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রম, প্রাইভেট কোচিংয়ের বাড় বাড়ন্ত, শিক্ষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বাণিজ্যিকীকরণ এইসব সরাসরি ছাত্রস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতেও কোন কথাই বলত না এস এফ আই এবং তাদের আয়ত্বাধীন (যা প্রায় সব কলেজেই) ছাত্র সংসদগুলো। অন্যদিকে রাজ্য, দেশ ও বিশ্ব রাজনীতির বৃহত্তর বিষয়গুলোতে কোন নীতিনিষ্ঠ অবস্থান বা আন্দোলনও গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। কেবল বামফ্রন্টের বা সি পি এমের অবস্থানের লেজুড়বৃত্তি করাটাই তাদের কাজ ছিল। তবে এস এফ আই-এর মধ্যে গোষ্ঠীবাজি থাকলেও তা গোষ্ঠী সংঘর্ষের রূপ খুব একটা নিত না।

ঠিক এখানেই আজকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এস এফ আই-এর থেকে পৃথক। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরে যে সমস্ত কলেজে নির্বাচন হয়েছে তার অধিকাংশতেই তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোন ছাত্র সংগঠনকে প্রার্থী দিতে দেওয়া হয়নি। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে নির্বাচিত হওয়ার আগের রীতি রয়ে গিয়েছে, কেবল আগে এস এফ আই নির্বাচিত হত এখন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ হচ্ছে। তারাও কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে, ছাত্র সংসদের টাকা নিয়ন্ত্রণ ও নয়ছয় করছে। যেখানে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সাথে তাল মেলাচ্ছে না, সেখানেই অধ্যক্ষ ঘেরাও, পেটাই, হেনস্থা করা চলছে। এছাড়াও নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে গণ্ডগোল পাকাচ্ছে তারা। অধিকাংশ কলেজেই দুই বা ততোধিক গোষ্ঠী আছে তৃণমূলের। তারা সবাই লাভের ভাগ চাইছে। ফলে মারামারি লাঠালাঠি। মণীন্দ্রচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, জয়পুরিয়া, সিটি, আনন্দমোহন ইত্যাদি কলেজগুলোতে এক তৃণমূল অপর তৃণমূলের সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ছে। ঐ গণ্ডগোলটা সামলাতে পারছিল না তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল নির্বাচন, বিভিন্ন ছুতোয়। খেয়াল করবেন, ২০১২ সালে আদালতে গিয়ে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ওপর স্থগিতাদেশ নিয়ে এসেছিল যারা, আদালত হুকুম দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন দিয়ে ঐসব নির্বাচন করাতে হবে, সেইসব আবেদনকারীর মধ্যে অনেকেই ছিল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কোন এক গোষ্ঠী। হরিমোহন ঘোষ কলেজের ঘটনা তাদের নির্বাচন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে করে দিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকলে তো আর কলেজ সোশ্যাল, নবীন বরণ, সরস্বতী পূজো, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা কলেজ ম্যাগাজিন ইত্যাদি ও সেই সংক্রান্ত তহবিলের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আর এরকম নিরামিষ নিঃস্বার্থ অবস্থায় কতদিনই বা থাকা সম্ভব? ফলে দলের ভিতর থেকেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার জন্য চাপ বাড়ছিল। অন্যদিকে বহুদিনকার প্রচলিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও তার ফলে ছাত্র সংসদ অচল রাখার ফলে বিরোধী দলগুলোও গণতন্ত্রহীনতার শ্লোগান তুলতে শুরু করেছিল। তবে মূলত ভিতরের চাপই নির্বাচন পুনরায় চালু করতে বাধ্য করেছে। তাই ছাত্র সংসদ নির্বাচন তৃণমূল কংগ্রেসের গণতন্ত্রের প্রতি কোন নিষ্ঠার প্রতিফলন নয়, ছাত্র সংগঠনের নেতাদের তুষ্ট করার জন্যই তা করা হচ্ছে।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিটি তৈরী করে কলেজগুলোতে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করে ফেলতে। এও বলেছে যে, পুলিশের সঙ্গে কথা বলে যথেষ্ট নিরাপত্তার ঘেরাটোপে যেন নির্বাচন হয়। পুলিশ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা ৩৩টি কলেজকে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করেছে। আগে কখনও এরকমটা হয়নি। তা বলে আগে নির্বাচন গণতান্ত্রিকভাবে হোত তা নয়, সেটা আগেই বলেছি। কিন্তু নির্বাচনের বহু আগেই সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলোতের মারামারি শুরু হয়। বেশিরভাগ কলেজেই শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা সংগঠন ব্যতিরেকে অন্য কোন সংগঠনকে কাজই করতে দেওয়া হয় না। কর্তৃপক্ষ ও শাসক দলের অনুগামী ছাত্র সংগঠনের নেতারা যুগপৎভাবে প্রতিবাদী ছাত্র সংগঠনকে নাস্তানাবুদ করতে থাকে। মারধর করে, হুমকি দিয়ে তা করা হয়। তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই কর্তৃপক্ষ পাত্তা দেয় না। সুতরাং ছাত্র সংসদ নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কথা বলতে চায় তাকে ভ্রূণাবস্থাতেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়ে থাকে। এর পরে নিরাপত্তার কথা বলা আসলে গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। যদি কলেজগুলোতে আগাগোড়া গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বজায় রাখা যেত তাহলে ছাত্রদের নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে ছাত্র সংসদ গড়ে উঠত, আর কলেজগুলোও হুলিগান নেতৃত্বাধীন ছাত্র সংসদের কবল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। সে ব্যাপার দৃকপাত না করে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে নির্বাচনের বন্দোবস্ত আসলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভুত গণ্ডগোল যাতে সীমা না ছাড়ায় সে বিষয়েই ভাবনা। তাই পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সরকারি নির্দেশিকা প্রকৃতপক্ষে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামাল দেওয়ার চেষ্টা, যা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। - **অমিত দাশগুপ্ত**

নির্মাণ শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শত শত নির্মাণ শ্রমিকরা কলকাতার রাজপথে বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হন।

১১ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের আহ্বানে শিয়ালদহ ও হাওড়া থেকে ২টি বড় মিছিল, এছাড়াও হুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতার বিভিন্ন এলাকা ও ব্লক থেকে আরও কয়েকটি মিছিল সহকারে নির্মাণ শ্রমিকরা সামিল হন। প্রায় ২ হাজার নির্মাণ শ্রমিক সমাবেশকে সফল করে তোলেন।

সভার শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন নীতীশ রায়। সভা পরিচালনা করেন সভাপতি প্রবীর দাস। প্রথমে বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সভাপতি অতনু চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ২০-২১ ফেব্রুয়ারী ২ দিন দেশব্যাপী ধর্মঘটের অভিঘাত এত জোরালো ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার সবার জন্য মাসিক ১০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি এবং মাসিক ন্যূনতম ১ হাজার টাকা পেনশন মানতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং শ্রমিকদের অধিকার আদায় করতে হলে লড়াইয়ের মাধ্যমে রাজপথেই তা আদায় করতে হবে।

সি পি আই (এম এল) রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলার স্মরণ সভায়। অথচ রাষ্ট্রপতি তার রাজনৈতিক জীবনে আমাদের দেশকে সাম্রাজ্যবাদের অনুগত করার নীতি অনুশীলন করে গেছেন। তাই এই ধরণের স্মরণসভায় তিনি বেমানান। আমাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরালো করেই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক কিশোর সরকার বলেন, উন্নয়ন শ্লোগানে তোলপাড় তোলা হচ্ছে অথচ বাস্তবে দেশের বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে নেমে আসছে। সংসদ বা বিধানসভায় এই প্রান্তিক মানুষদের উন্নয়ন নিয়ে কোন আলোচনা হয় না। সাংসদ আর বিধায়কদের কর্পোরেট ঘরানায় কতটা ছাড় দেওয়া যায় সে ব্যাপারে বেশী চিন্তিত। কৃষি, শিল্প, পরিষেবা ক্ষেত্রের অবস্থা যখন তলানিতে, তখন রূপালী নির্মাণ ক্ষেত্রই একমাত্র বিকাশমান। এই শিল্পে অতিমুনাফা হচ্ছে অথচ নির্মাণ শ্রমিকরা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। সরকারি-বেসরকারি বড় বড় নির্মাণ শিল্পে কোনরকম শ্রম কানুন মানা হয় না। ফলে নির্মাণ শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি, প্রকল্পের আর্থিক অনুদান এবং নিরাপত্তার জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হয়ে এক অমানুবিক পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হন। নির্মাণ শ্রমিকদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে লড়াইকে জোরদার করতে হবে।

এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সম্পাদক বাসুদেব বসু বলেন—দেশের বর্তমান আর্থিক সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য বহুজাতিকদের ওপর আরও বেশি নির্ভর করার যুক্তি হাজির করা হচ্ছে। অথচ এই পথেই দু-দশকে দেশ চরম আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে, বহুজাতিকদের সপক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে আর সাংবিধানিকভাবে অর্জিত শ্রমিকদের অধিকারকে লঙ্ঘন করার জন্য নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এমনকি হরণ করা হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার। পশ্চিমবঙ্গ গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কার্যকরি সভাপতি দ্বৈপায়ন বলেন, পশ্চিমবঙ্গে সরকার নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে সেস আদায়, শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণ, আর্থিক প্রকল্পে অনুদান প্রদানের কাজে পিছিয়ে আছে। ঢিমেতালে কাজ চালিয়ে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি হতাশা তৈরী করতে চাইছে। কিন্তু আজকের জমায়েত হচ্ছে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রত্যুত্তর, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্বে জোরালো আন্দোলন করেই দাবি আদায় করতে হবে। দেশে দুর্নীতি প্রধান ইস্যু হয়ে গেছে অথচ আমাদের রাজ্যেও সারদাকাণ্ডে সাংসদ-বিধায়কদের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। সততার প্রতীকরা ভয় পাচ্ছে সি বি আই তদন্তে। দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যকে ভাঙ্গতে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো হচ্ছে। আমাদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী ঐক্য বজায় রাখতে হবে। শ্রমমন্ত্রীর কাছে পেশ করার দাবিসনদ পাঠ করে শোনান ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক। দাবি সনদ হল—

(১) সরকারি-বেসরকারি নির্মাণ কাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রম কানুন মানা হচ্ছে না। ফলে নির্মাণ শ্রমিকরা সরকারিভাবে ঘোষিত সর্বনিম্ন মজুরি সহ নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাই অবিলম্বে আইন ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (২) নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদে আমাদের ইউনিয়নের প্রতিনিধি রাখতে হবে। (৩) সেস্ আদায়ের ক্ষেত্রে দিল্লী, মহারাষ্ট্র সহ বহু রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে আছে। পরিপূর্ণ সেস্ আদায় করতে অবিলম্বে সরকারকে অভিযানে নামতে হবে। সেস্-এর পরিমাণ ২ শতাংশ করতে হবে। (৪) আদায়কৃত সেস্ বাবদ অর্থের মাত্র ১০.৩৭ শতাংশ শ্রমিক কল্যাণে ব্যয় হয়েছে; যা কেরল, তামিলনাড়ু, ছত্তিশগড় সহ বহু রাজ্য থেকে অনেক কম। শ্রমিক কল্যাণে ব্যয়বৃদ্ধি করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ঃ—(ক) পশ্চিমবাংলায় যে কোন স্থানের শ্রমিককে, যে কোন স্থান থেকে নাম সরকারিভাবে নথিভুক্তকরণের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, (খ) পরিযায়ী শ্রমিক আইন কঠোরভাবে লাগু করতে হবে, (গ) সরকারি-বেসরকারি নির্মাণ শিল্পে সমস্ত শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণের সরকারি উদ্যোগ নিতে হবে, (ঘ) নাম নথিভুক্তকরণ ও প্রকল্পের অর্থ প্রদান ব্যবস্থা সরলীকরণ করতে হবে, যাতে শ্রমিকরা এক মাসের মধ্যে প্রকল্পের অর্থ পেতে পারে, (ঙ) প্রতিটি প্রকল্পের আর্থিক পরিমাণ দ্বিগুণ করতে হবে, পেনসন মাসিক ন্যূনতম ৩০০০ টাকা করতে হবে, (চ) শহরে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য আবাসন গড়ে তুলতে হবে, গ্রামাঞ্চলে নির্মাণ শ্রমিকদের জমি দান করতে হবে, (ছ) নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি (প্রভিডেন্ট ফাণ্ড) চালু করতে হবে, (৫) আজকের দিনে সর্বনিম্ন স্তরের জীবন যাপন করতে নির্মাণ শ্রমিকদের দৈনিক ন্যূনতম ৫০০ টাকা মজুরি চালু করতে হবে।

গোটা সমাবেশে একটা সংগ্রামী মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। শেষে নীতীশ রায় ও বাবুনি মজুমদারের গণসঙ্গীত ও শ্লোগানে মুখরিত হয়ে সভা শেষ হয়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় সাতের পাতায় ''কোল ইণ্ডিয়া ... যুক্ত কনভেনশন'' রিপোর্টে পঞ্চম লাইনে পড়তে হবে ''... এ আই টি ইউ সি-র সর্বভারতীয় সভাপতি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ... আই এন টি ইউ সি-বি এম এস-এর অনুপস্থিতি এক গভীর সমস্যা।'' ...

অনির্বাণ জ্যোতির এক বছর

ফিরে দেখা ঃ ১৬ ডিসেম্বরের যৌন হিংসা-বিরোধী আন্দোলন

কামদুনি, গেদে, গাইঘাটা, রানীতলা—সারা রাজ্য জুড়ে একের পর এক যখন পুরুষতান্ত্রিক হামলা নামছিল স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের ওপর; তখন ২১ জুন ২০১৩ তারিখে কলকাতা দেখেছিল নাগরিকদের এক মহামিছিল। দশ হাজার মানুষ। সামনের সারিতে সুটিয়া, গেদে, কামদুনির জনতা। নির্যাতিতাদের পরিবার, প্রতিবেশী বন্ধুরা। নির্যাতিতারা স্বয়ং। পোস্টার, প্ল্যাকার্ড হাতে অগুনতি ছাত্র, ছাত্রী, যুবক, যুবতী। শাসকের বুকে কাঁপুনি ধরানো, ২০০৭-এর স্মৃতি জাগানো সেই মহাসমাবেশের এক পাশে কয়েকজন তুলে ধরেছিলেন আর একটা ব্যানার। লাল সালুর ওপর সাদা কাগজ সেঁটে লেখা এক লাইনের সংহতি বার্তা। 'নারীর প্রতি হিংসাত্মক ঘটনার বিরোধিতায় রূপান্তরকামী নারী'। যাকে আমরা কখনও প্রান্তিক যৌনতা বলি আবার কখনও ভিন্ন যৌনতা। তাদেরই কয়েকজন পায়ে পা মিলিয়েছিলেন নাগরিক মহামিছিলে। আজ যখন ৩৭৭ ধারাকে পুনরায় বহাল করার মধ্যে দিয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট সেই প্রান্তিক যৌনতার মানুষদের নাগরিক অধিকার, ভালবাসার অধিকার কেড়ে নিয়েছে তখন আমরা দেখছি দেশজুড়ে শ্লোগান উঠছে। ছাত্র আন্দোলন, নারী আন্দোলন, যুব আন্দোলন হাত ধরে দাঁড়িয়েছে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী, হিজরা সহ প্রান্তিক যৌনতার সমস্ত মানুষের পাশে। কলেজ স্ট্রীটে পোস্টার দেখা গেল, 'চূর্ণ করো পুরুষতান্ত্রিক ব্যারিকেড। সমকামিতা স্বাভাবিক একটি প্রবৃত্তি। লড়াই করো সমকামী অধিকারের জন্য। ৩৭৭ ধারাকে ছিঁড়ে ফেল।' নারী আন্দোলন শ্লোগান তুলে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছে 'নারী মুক্তি সকলের মুক্তি'। এইভাবেই বোধহয় লড়াইয়ের রাস্তায় প্রকৃত সংহতির বৃত্ত রচিত হয়। পথেই হয় পথ চেনা।

১৬ ডিসেম্বর তারিখটা আমরা ভুলব না। ঠিক যেভাবে ডিসেম্বর মাসেরই আর একটা কালো তারিখ আমাদের স্মৃতিতে প্রোথিত হয়ে থাকে। নতুন করে শপথ নেওয়ার শক্তি দেয়। সে দিন জ্যোতি সিনেমা দেখে ফেরার পথে চলন্ত বাসে নৃশংস আক্রমণের শিকার হয়েছিল। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে সে কয়েকদিন বাদে হেরে যায়। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ঢল যেমন নেমেছিল, তেমনি ক্ষোভের বারুদ ফেটে পড়ছিল সারা দেশজুড়ে। দিল্লীর মত নিথর শহরেও হাজারে হাজারে সাধারণ মানুষ রাজপথের দখল নিয়েছিল। মথুরা ধর্ষণ মামলা এবং থাংজাম মনোরমার সেনাবাহিনী-কৃত ধর্ষণ-হত্যার পর আরও একবার নারীর ওপর পিতৃতান্ত্রিক হিংসার বিষয়টি গোটা দেশের সামনে মুখ্য আলোচিত বিষয় হয়ে উঠেছিল। সাধারণ মেয়ে জ্যোতি হয়ে উঠেছিল নির্ভয়া, লড়াইয়ের প্রতীক। সেই আলোচনা, সেই লড়াই আজও থামেনি। নির্ভয়ার পথ ধরে প্রবল দাবির মুখে দেশের ধর্ষণ আইন পরিবর্তন করতে গঠিত হয়েছিল ভার্মা কমিটি। তার সুপারিশগুলোর মধ্যে মাত্র কয়েকটি গ্রহণ করে সংসদ। পরিবর্তন করে যৌন হিংসা আইন। কিন্তু আরও অনেক সুপারিশ তারা গ্রহণ করেনি। স্বামীর দ্বারা স্ত্রীর ধর্ষণ এখনও আইনসিদ্ধ! এই ধর্ষণকে অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করা এবং অন্যান্য ধর্ষণের মত উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনা সহ আইন পরিবর্তনের আরও দাবি উঠছে মানুষের মুখে মুখে।

এদিকে এত উথালপাথালের মাঝেও ধর্ষণ এবং যৌন হিংসার ঘটনা ঘটেই চলেছে। অনেকে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা অনুভব করছেন। এত আন্দোলনের ফল তাহলে কী হল? কেউ বলছেন কিছু বদলায়নি, কিছুই বদলায় না। কিন্তু সত্যিই কিছুই বদলায়নি? তহেলকার সাংবাদিক মেয়েটি হেনস্থার কথা প্রথম জানায় তার পুরুষ সহকর্মীদের কাছে। তার পূর্ণ আস্থা ছিল যে সহকর্মীরা তার পাশে দাঁড়াবে। সেটাই হয়েছে। সেই তিনজন সহকর্মী কোনও চাপের মুখে মাথা না নুইয়ে তার বয়ানের পক্ষে সাক্ষী দিয়েছেন। মেয়েটির কিছু সহকর্মী প্রতিবাদে ইস্তাফা দিয়েছে। টিভির পর্দায় বলেছে সংহতির কথা। এরা সকলেই নির্ভয়ার থেকে প্রেরণা পেয়েছে। মুম্বাইয়ের সাংবাদিক মেয়েটিও গণধর্ষণের পর সোজা থানায় গিয়ে এফ আই আর দায়ের করেছিল। সে বলেছে সুস্থ হয়ে উঠে সে আবার যাবে ঐ জায়গায় খবর সংগ্রহ করতে। কামদুনির অপরাজিতার বাড়ির মানুষগুলোর দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে টাকার লোভ, চাকরির টোপ দিয়ে মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে মমতা ব্যানার্জীর সরকার। তবু আগুন নেভে কই? অপরাজিতার লড়াই এখন সমস্ত নির্ভয়ার লড়াই। পার্ক স্ট্রীটের সুজেট, জগাছার সেলিনা মুখ না লুকিয়ে ব্যারিকেডের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাদের মুখগুলো নির্ভয়ারই মুখ। ভেঙে দিচ্ছে পিতৃতন্ত্রের ব্যারিকেড। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি অশোক গাঙ্গুলী বহু যুগের অভ্যাসের বশেই হয়ত ভেবে বসেছিলেন যে শিক্ষানবীশের ওপর পদাধিকারের বলে তাঁর কিছুটা প্রভুত্ব বর্তায়। তাই যৌন হয়রানি করে নিশ্চিন্তে ছিলেন। কিন্তু মেয়েটি? এক বছর চুপ করে থাকার পর ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে। পাশে পেয়েছে এমনকি সমস্ত রাজনৈতিক দলকেও! কি করে এই অসাধ্য সাধন হল? কারণ হাওয়া ঘুরে গেছে। যুবসমাজ, নারীসমাজের চীৎকার হাওয়াকে ঘুরিয়ে দিয়েছে। এক বছর আগে হলেও আমরা প্রতিক্রিয়া পেতাম—কি আর এমন করেছে। ধর্ষণ তো আর করেনি। অথচ এখন সমস্বরে দাবি উঠে গেছে অশোক গাঙ্গুলীকে তার পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। হোক না তিনি মহামান্য আদালতের দুঁদে বিচারপতি। আসলে উচ্চপদে আসীন ক্ষমতাশালী অসংখ্য অশোক গাঙ্গুলী, অগুনতি তরুণ তেজপাল, নানা রঙের আসারাম বাপুদের বুকে কাঁপন ধরেছে। একে একে মুখোশগুলো টেনে খোলা হবে। তখন এই মহামান্যদের সম্মানীয় চেহারা আর নির্ভয়ার ধর্ষক রাম সিং-দের চেহারায় আর কোনও তফাত থাকবে না। সমাজের উচ্চপদস্থদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে যে মেয়েরা অভিযোগ আনছেন, যেভাবে সমাজের একটা বড় অংশকে পাশে পাচ্ছেন, তা কি আন্দোলনের ফসল নয়? তা কি দিনবদলের ইঙ্গিত আনছে না?

অথচ এখনও অনেক পথ চলা বাকি। দীর্ঘ রাস্তা। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা আবার আমাদের সেকথা মনে করিয়ে দেয়। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্দেশে অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াড সহ সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র একটি মেয়ের গতিবিধির ওপর দিনের পর দিন বেআইনি নজরদারি চালিয়ে গিয়েছে। সে কার সঙ্গে ঘুরছে, কার সঙ্গে খাচ্ছে, কোথায় কোথায় যাচ্ছে, রাতে কোথায় থাকছে—তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ মিনিটে মিনিটে পৌঁছে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর অনুগতদের কাছে। কারণ? 'এলাটিং বেলাটিং সই লো। রাজামশাই একটি বালিকা চাইল'। এরপর নারী আন্দোলন ও বামপন্থী আন্দোলনের ভেতর থেকে জোরালো ধিক্কার উঠেছে। কিন্তু তা জনগণের মধ্যে সেরকম জোরের সঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয়নি। তাপসী মালিক, থাংজাম মনোরমা, সোনি সোরি, আসিইয়া জান, নীলোফার জান, শিবানী সিং সহ অসংখ্য নারী সরাসরি রাষ্ট্রযন্ত্রের ধর্ষণের শিকার, তাদের পাশে লাখো লাখো সাধারণ মানুষ এখনও সেভাবে দাঁড়াননি। থাংজাম মনোরমার যোনিতে আটটি বুলেট পাওয়া গেছিল। রাষ্ট্রের বুলেট। উত্তাল হয়েছিল মণিপুর। কিন্তু সেনাবাহিনীর একজনের নামেও চার্জশিট হয়নি। এ এফ এস পি এ নামক কালাকানুন আজও বহাল রয়েছে। পুলিশী হেফাজতে সোনি সোরির যোনিতে পাথরকুচি ঢুকিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল যে অফিসার, সেই অঙ্কিত গর্গ প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতির পদক পেয়েছেন, বীরত্বের জন্য। এই এক বছরে খাপ পঞ্চায়েতের মৃত্যু-পরোয়ানা শেষ করে দিয়েছে অসংখ্য নারী-পুরুষের জীবন। নরেন্দ্র মোদী, গুজরাতের অসংখ্য ধর্ষণ, হত্যার সুপ্রীম কমাণ্ডার। যার দল অতি সম্প্রতিও মুজফফরনগর দাঙ্গা, হত্যা, ধর্ষণ ঘটানোয় অতি সক্রিয়। তিনি ভারতের মসনদে বসার জন্য মরিয়া প্রচার চালাচ্ছেন। এর মধ্যে নতুন আঘাত নামল সমকামী মানুষদের ওপর। বাংলাদেশে যখন মৌলবাদীদের গড়ে আঘাত হানছে সেখানকার সংগ্রামী জনতা, তখন ভারতে মৌলবাদী সামন্তী শক্তিদের হাত শক্ত করছে মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে নারী আন্দোলনকে তার সমস্ত ব্যাপ্তি ছাপিয়ে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ধারণ করতে হবে। যৌনহিংসা বিরোধী আন্দোলনকে বৃহত্তর লিঙ্গসাম্যের আন্দোলন, গণতন্ত্রের আন্দোলনের সঙ্গে এক করে ছড়িয়ে দিতে হবে ঘরের ভেতর, কর্মস্থলের মধ্যে, থানা, আদালত, সেনাছাউনি সহ রাষ্ট্র কাঠামোর প্রতি পরতে।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৩। সোনি সোরি হাজির হলেন যন্তর মন্তরের প্রতিবাদ সভায়। নির্ভয়া সোনি সোরি। প্রতিটা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ স্মরণ করল তাদের দামিনী আর নির্ভয়াদের। কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে চোখে পড়ল বহু পোস্টার। নারী সংগঠন, ছাত্র-যুব সংগঠন, এল জি বি টি সংগঠন ও বামপন্থী দলগুলোর বাইরেও অসংখ্য মানুষ সেখানে সামিল। বাজারি মিডিয়া চাইলেও এই জাগরণকে আর এড়িয়ে যেতে পারে না। দিল্লীর নির্ভয়া অনির্বাণ মশাল জ্বালিয়ে গেছে মানুষের বুকে। পথ হাঁটা চলবে। পথেই হবে পথ চেনা।

- কস্তুরী

নির্ভয়া স্মরণে জেলায় জেলায়
সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির কর্মসূচী

শিলিগুড়িতে আলোচনাসভা

১৬ ডিসেম্বর, ২০১২ দিল্লী গণধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং নির্ভয়াকে স্মরণ করে শিলিগুড়িতে আইপোয়া একটি আলোচনাসভা সংগঠিত করে। সভার শুরু হয় আইপোয়া দার্জিলিং জেলার সভাপতি মীরা চর্তুবেদীর স্বরচিত কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে। এরপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক গৌরী দে এবং আইসার পক্ষে শাশ্বতী সেনগুপ্ত। প্রত্যেকেই দিল্লী থেকে কামদুনি, সব ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান। এছাড়া দেশজুড়ে ঘটে চলা নারী নির্যাতনের সমস্ত ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন, ছাত্রী ও মহিলা সহ ২৫ জন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভাটি পরিচালনা করেন মীরা চর্তুবেদী।

বারাসাতে প্রচার সভা

আজ থেকে এক বছর আগে একটি কালো দিনে দিল্লীর বুকে ঘটেছিল নির্ভয়ার ধর্ষণ ও নারকীয় হত্যার ঘটনা। তার স্মরণে এক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় আইপোয়ার উত্তর ২৪ পরগণার পক্ষ থেকে বারাসাত স্টেশন চত্বরে। নির্ভয়ার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং নীরবতার মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের অন্যতম সংগঠক বাবুনী মজুমদারের বক্তব্য এবং তার উদাত্ত কণ্ঠে গণসঙ্গীত ''যত হামলা কর, সব সামলে নেব'' ... গানের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভায় মহিলা সমিতির পক্ষে মৈত্রেয়ী বিশ্বাস, প্রণতি নাথ এবং জেলা সম্পাদিকা অর্চনা ঘটক বক্তব্য রাখেন। আইসার পক্ষ থেকে রোহন, সি পি আই (এম এল) বারাসাত লিডিং টীমের পক্ষে দিলীপ দত্ত বক্তব্য রাখেন। সভায় সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সভানেত্রী জয়শ্রী দাস। চিত্রীশিল্পীর আঁকা ছবি ও পোস্টার পথ চলতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

চুঁচুড়ায় মিছিল

১৬ ডিসেম্বর দিল্লীতে নির্ভয়ার গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর একটি বছর কেটে গেল। এই দিনটি নির্ভয়া দিবস হিসেবে সর্বভারতীয় কর্মসূচী হিসেবে পালিত হয়। তারই অংশ হিসেবে সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির হুগলী জেলা শাখা এই দিবস পালন করে চুঁচুড়ায়। শ্লোগান ওঠে—দিল্লী থেকে কামদুনি সহ সমস্ত ধর্ষক ও খুনীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, রাজ্যে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে হবে, নির্যাতিতা মহিলাদের এফ আই আর নিতে প্রতিটি থানায় মহিলা পুলিশ অফিসার নিয়োগ করতে হবে, যৌন হেনস্থার অপরাধে মানবাধিকার চেয়ারম্যান অশোক গাঙ্গুলীকে অপসারণ করতে হবে।

পোস্টারে সজ্জিত একটি মিছিল চুঁচুড়া কোর্ট চত্বর পরিক্রমা করে। চুঁচুড়া থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সমগ্র কর্মসূচীতে ''আশা'' ও মিড-ডে মিল রন্ধনকর্মী ইউনিয়নও অংশ নেয় এবং কর্মক্ষেত্রে তাঁদের নিরাপত্তার দাবিটিও তুলে ধরে। থানার সামনে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদিকা শিপ্রা চ্যাটার্জী, সভানেত্রী শোভা ব্যানার্জী, রাজ্য সম্পাদিকা চৈতালি সেন, চুঁচুড়ার পার্টি সদস্য ভিয়েত ব্যানার্জী। এরপর নির্ভয়া, অপরাজিতাদের স্মরণে মোমবাতি মিছিল দিয়ে কর্মসূচী শেষ হয়। এতে অংশ নিয়েছিলেন ছিলেন সি পি আই (এম এল) জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার এবং অন্যান্য স্থানীয় কমরেডরা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অভি দত্ত মজুমদার আমাদের প্রেরণা হয়ে থাকবেন

চলে গেলেন অভি দত্ত মজুমদার। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এই বিজ্ঞানীর প্রয়াণ আমাদের সবাইকেই শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে। বিজ্ঞান জগতের পাশাপাশি শোকের ছায়া নেমেছে রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান আন্দোলন, লিটল ম্যাগাজিন সহ চিন্তাচর্চার সঙ্গে যুক্ত এক ব্যাপ্ত পরিধিতে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অসংখ্য কর্মী, খুচরো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু দোকানদার সহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষ অভি দত্ত মজুমদারের চলে যাওয়ার খবর পেয়ে মর্মাহত হয়েছেন। কারণ গণআন্দোলনের সূত্রে বহু ব্যাপ্ত পরিসরেই অভিদা (ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে এই নামেই ডাকতাম তাঁকে) জড়িয়ে ছিলেন।

২০০৪-০৫ সালে সাহা ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের হাই এনার্জি ফিজিক্স ল্যাবরেটরিতে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন অভি দত্ত মজুমদার। আদি বাড়ি হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায়। কলকাতায় থাকাকালীনই এবং তারও আগে কানাডার মন্ট্রিয়েলে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করতে করতেই পাণ্ডুয়ায় নিজেদের বাড়িতে গড়ে তুলেছিলেন দরিদ্র ঘরের শিশুদের নিয়ে একটা নৈশ স্কুল। বিভিন্ন বন্ধুদের অর্থ সাহায্যে চলত সেই স্কুল। বর্তমানে সেখানে একটি লাইব্রেরীও গড়ে উঠেছে। সমাজের প্রতি তার এই সংবেদনশীলতার পরিচয় প্রথম থেকেই টের পেতেন সাহা ইনস্টিটিউটের সহকর্মী এবং তার আশপাশের বন্ধুরা। ২০০৬-এর এমনই সমমনোভাবাপন্ন কিছু সহকর্মী বন্ধুদের নিয়ে গড়ে ওঠে একটি ছোট্ট কোর গ্রুপ, যার নাম দেওয়া হয় ''প্লাটফর্ম''। প্রায় একই সময় সাহা ইনস্টিটিউট এবং কলকাতার আরও কয়েকটি বিজ্ঞান গবেষণাগারের বিজ্ঞানীদেরকে সঙ্গে নিয়ে ''প্রমিস্'' বলে একটি উদ্যোগ সংগঠিত হয় পদার্থ বিদ্যার আন্তর্জাতিক বর্ষ ২০০৫-কে সামনে রেখে। প্রকাশিত হয় বাংলায় বিজ্ঞান চর্চার একটি বই ''এবং আইনস্টাইন''। এমনি বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে অভি দত্ত মজুমদারের সাংগঠনিক শক্তি প্রকাশিত হতে থাকে।

বিজ্ঞান গবেষণার বাইর বেরিয়ে এসে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ শুরু সিঙ্গুর আন্দোলনের পর্ব থেকে। সেই সময় সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে গবেষণারত কয়েকজন গবেষক, বিজ্ঞানী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক, কয়েকজন বিদ্যালয় শিক্ষক মিলে তৈরি করেন ''টাসাম'' নামের এক সংগঠন। যার পুরো কথাটা ছিল টিচার্স অ্যাণ্ড সায়েন্টিস্টস এগেইনস্ট ম্যাল ডেভেলপমেন্ট। সিঙ্গুরে টাটার ন্যানো কারখানার জন্য জোর করে কৃষকের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তখন প্রাথমিক পর্বে। আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য রাজ্যের প্রধান শাসক দল সি পি এম এবং তার গণসংগঠনগুলো জমি অধিগ্রহণকে 'উন্নয়ন'-এর স্বার্থে অপরিহার্য বলে প্রমাণে বদ্ধপরিকর। ২০০৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সি পি এমের প্রধান অ্যাজেণ্ডাই তখন হয়ে উঠেছে কৃষিকে নস্যাৎ করা। 'কৃষকের (শিল্প/রিয়েল এস্টেটের জন্য) জমি বেচে দেওয়াটাই উচিৎ কারণ কৃষি করে লাভ আর হবে না', এটাই যুক্তি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছিল। যেটুকু বিতর্ক সেটা শুধু অধিগ্রহণের পদ্ধতি নিয়ে। রাজারহাট মডেলের সাফল্য আর সিঙ্গুর মডেলের ব্যর্থতা—এরকমভাবেই আলোচনা এগোচ্ছিল সি পি এমের মধ্যে এবং সমর্থক মহলে। গোটা ভারতেও এই সময়ে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া গতি পেতে চাইছিল সংসদে নতুন পাশ হওয়া এস ই জেড নীতিকে কেন্দ্র করে। এস ই জেড আইন পাশ হওয়ার সময় তার বিরুদ্ধে সংসদে একটি ভোটও পড়েনি, কিন্তু এই আইন রূপায়ণের পর্বে সর্বত্র প্রবল বাধার মুখোমুখি হয়েছিল। ডান, সংসদীয় বাম সবার মধ্যে জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প/পরিকাঠামো/রিয়েল এস্টেট তৈরির উন্নয়ন মডেল নিয়ে একটা সামীপ্য দেখা গিয়েছিল। যদিও সব রাজ্যেই কৃষকদের ব্যাপক বাধার সামনে পড়তে হয় এই অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াকে, দেশজুড়ে জন্ম নেয় জমির অধিকার রক্ষার জন্য ব্যাপক কৃষক আন্দোলন।

এই আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশকে আকর্ষণ করে, তাঁরা এগিয়ে আসেন আন্দোলনের সমর্থনে। অভিদা ছিলেন এঁর সামনের সারিতে। 'উন্নয়ন' কী, কার স্বার্থে, কীভাবে হবে এই উন্নয়ন—এই নিয়ে বিতর্ক তুলে শাসকের হাজির করা উন্নয়ন মডেলটিকেই সমস্যায়িত করে দেয় 'টাসাম', একে আখ্যা দেন 'অপ-উন্নয়ন' বলে। একই কাজে তখন করে চলেছে সি পি আই (এম এল) সহ নানা রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠন, লিটল ম্যাগাজিন সহ পত্র পত্রিকার দুনিয়াও।

এই কাজটা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে সে সময় লাগাতারভাবে করেছিলেন অভিদা। শুধু পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করা বা আলোচনাসভায় বক্তৃতা দেওয়াই নয়, বক্তব্য প্রচারের জন্য নিজের হাতে সে সময় রাজনৈতিক কর্মীর মতোই দিনের পর দিন দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার মেরেছেন এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। এই পর্ব থেকেই স্পষ্ট হয়েছিল বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর অস্মিতা কোনদিনই তাঁকে গ্রাস করেনি। বরাবরই সাধারণ জীবন যাপন করেছেন অভিদা, সহজ ব্যবহার সবার কাছেই তাঁকে গ্রহণযোগ্য, কাছের মানুষ করে তুলেছিল।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের পর্বের সময়েই শুরু হল আর এক আন্দোলন। নয়াচরে কেমিক্যাল হাব তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এই কেমিক্যাল হাব কতটা বিপজ্জনক একটি প্রকল্প, তা নিয়ে পুস্তিকা লিখলেন অভিদা। দেশ বিদেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ সহজভাবে ব্যাখ্যা করে লেখা সে পুস্তিকা হাজারে হাজারে বিক্রি হল। যে পরিবেশকর্মী ও মৎসজীবীরা এ নিয়ে আন্দোলনে সামনের সারিতে ছিলেন, এই পুস্তিকা তাঁদের অন্যতম ইস্তাহার হয়ে দাঁড়াল।

জাতীয় রাজনীতিতে এই সময়েই বিতর্ক তুলল ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি সংক্রান্ত বিতর্ক। এর বিজ্ঞানগত দিকটি সরাসরি অভিদার গবেষণার বিষয়। কিন্তু এই নিয়ে প্রকাশিত পুস্তকে অভিদা বিশেষভাবেই দেখিয়েছিলেন পরমাণু চুক্তি মোটেই শুধু পরমাণু শক্তি উৎপাদনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নয়। এই চুক্তির আরেকটি বিপদের দিক দেশের সার্বভৌমতা সংক্রান্তও বটে।

এই পর্বে যে বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের আম জনতা আরেকবার আন্দোলিত হয়ে ওঠে সেটা হল খুচরো ব্যবসায়ে একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের থেকে কোনও শিক্ষাই না নিয়ে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার সে সময় বেশ কিছু একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীকে রাজ্যের খুচরো ব্যবসায় প্রবেশের অনুমতি দেন। এর বিরোধিতা করার জন্য জনপ্রিয় পুস্তিকা প্রকাশের পাশাপাশি তৈরি হয় একটি নতুন সংগঠন, ফামা (ফোরাম এগেইনস্ট মনোপলিস্টিক এ্যাগ্রেশন)। এই সময় গোটা রাজ্যজুড়ে ফামার পক্ষ থেকে অন্যান্যদের সঙ্গে প্রচারে সামিল হন অভিদা, অসংখ্য পথসভা, জনসভা, সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

বামপন্থার প্রতি ঐকান্তিক সমর্থন থেকেই বামফ্রন্টের 'দক্ষিণপন্থী নীতি'র বিরুদ্ধে প্রচারের কাজটা সংগঠিত করেছিলেন অভি দত্ত মজুমদার। দেশব্রতী পত্রিকা আয়োজিত আলোচনাসভায় তিনি যেমন বক্তব্য রেখেছেন, তেমনি এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর আহ্বানে এখানে লেখালিখিও করেছেন আগ্রহের সঙ্গে। পিপল্স হেল্থ আয়োজিত এক সভায় বক্তব্য রেখেছেন। ''অনীক'', ''অন্য স্বর'' সহ বিভিন্ন পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখেছেন। ''দেশব্রতী'' পত্রিকা এবং সি পি আই (এম এল)-এর সঙ্গে যুক্ত অনেকের সঙ্গেই তাঁর ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর এই অকাল প্রয়াণ আমাদের অনেকের কাছেই ব্যক্তিগত স্তরেও এক বড় ধাক্কা। তাঁর শেষযাত্রায় মাল্যদান করে ''দেশব্রতী'' ও সি পি আই (এম এল)-এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জ্যোতি ভট্টাচার্য ও অমিত দাশগুপ্ত। পার্টির সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর মৃত্যুর পরেই এক শোকবার্তায় লেখেন, ''ডঃ অভি দত্ত মজুমদার, যিনি ছিলেন একাধারে এক তরুণ পরমাণু বিজ্ঞানী ও অন্যদিকে কর্পোরেট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক বড় সৈনিক, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে আজ বিদায় নিলেন। তাঁর অকাল প্রয়াণ এক বিরাট ক্ষতি। তাঁর সাহসী ও তন্নিষ্ঠ সক্রিয়তা নবীন বুদ্ধিজীবীদের কাছে প্রেরণা হয়ে থাকবে''।

(কিছু তথ্যসূত্রের জন্য কৃতজ্ঞ অভি দত্ত মজুমদারের সহকর্মী ও বর্তমানে আই এস আই-এর অধ্যাপক কুন্তল ঘোষের কাছে।) - **সৌভিক ঘোষাল**

দিল্লীর শ্রমিক মিছিলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বার্তা

১২ ডিসেম্বর এ আই সি সি টি ইউ সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সংসদ অভিমুখী এক যৌথ মিছিল দিল্লীর বুকে আলোড়ন তুলল। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ও সরকার গঠনের জটিলতা নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক আবহে প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যম অবশ্য এই খবরটির প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এ বছরের ২০-২১ ফেব্রুয়ারির দেশব্যাপী ধর্মঘটের পর আরেকবার এই মিছিলের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী বৃহত্তর আন্দোলনের যে বার্তা দিল আগামী দিনে গোটা দেশেই তার তাপ অনুভূত হবে। দশ দফা দাবিতে এই মিছিল সংগঠিত হয়। দাবিগুলো ছিল ঃ

(১) মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। (২) শ্রম আইনকে কঠোরভাবে রূপায়ণ করতে হবে। (৩) অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষাকে সার্বিক করে তোলার জন্য জাতীয় স্তরে 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল' গঠন করতে হবে। (৪) স্থায়ী কাজে ঠিকা প্রথা চলবে না। একই ধরণের কাজের জন্য ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিকদের হারে বেতন দিতে হবে। (৫) ন্যূনতম মাসিক দশ হাজার টাকা বেতন ধার্য করতে হবে এবং একে উপভোক্তা মূল্যমানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। (৬) রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণ/বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে। (৭) কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৮) সবার জন্য পেনশন প্রকল্প চালু করতে হবে। (৯) বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটির ক্ষেত্রে সমস্ত সিলিং তুলে দিতে হবে। (১০) আই এল ও কনভেনশনের ৮৭ ও ৮৮ নং ধারা মেনে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের নথিভুক্তকরণের কাজ ৪৫ দিনের মধ্যে করে ফেলতে হবে।

দিল্লী ছাড়াও এই মিছিলে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করেন। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক থেকে ভালো পরিমাণ শ্রমিক এই মিছিলে অংশ নিতে আগেই দিল্লী পৌঁছে গিয়েছিলেন। শহর-শহরতলীর পাশাপাশি ছিলেন গ্রামীণ শ্রমিকেরা; সংগঠিত শ্রমিকদের পাশাপাশি অসংঠিত শ্রমিকেরা, পুরুষ নির্মাণ কর্মীর পাশে মিড-ডে মিলের মহিলা রন্ধনকর্মীগণ। মিছিলের শেষে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধিদল প্রথমে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি ও পরে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও দাবিসনদ তুলে দেন।

শাসকশ্রেণী যখন আগামী লোকসভা নির্বাচনকে মোদী বনাম রাহুল দ্বৈরথে পরিণত করতে চাইছে, তখন শ্রমিকশ্রেণী ও দেশের গণতান্ত্রিক কণ্ঠস্বর এই সমস্ত দাবিসনদের ভিত্তিতে নির্বাচনী লড়াইয়ে সামিল হয়ে নির্বাচনকে যে ব্যক্তির লড়াই নয়, জনগণের প্রকৃত দাবিদাওয়ার লড়াইয়ে পরিণত করতে চাইবে; তার প্রমাণ থাকলো রাজধানীর বুকে এই দৃপ্ত কর্মকাণ্ডে

চাঁদপাড়ায় পথসভায় তৃণমূলের হামলা ব্যর্থ হল

৮ ডিসেম্বর রবিবার ''খাদ্য চাই, গণতন্ত্র চাই, উন্নয়ন চাই''—এই বিষয়কে নিয়ে গাইঘাটা ব্লকে চাঁদপাড়া বাসস্ট্যাণ্ডে গাইঘাটা লোকাল কমিটির আহ্বানে সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন কার্তিক দে। তিনি খাদ্য, মূল্যবৃদ্ধি, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করেন। এলাকায় চালুন্দে খাল, সাহেব বাগানের সংস্কারে মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সভায় প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, খাদ্যদ্রব্যের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের বিশেষ করে সারদা কেলেঙ্কারির বিষয়টিকে তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সততার বিষয়ে প্রশ্ন তুলে ধরেন। মিড-ডে মিল, আশা ইত্যাদি প্রকল্পে মহিলাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে সাম্মানিক ভাতার নামে। তিনি আরও বলেন, তৃণমূল ক্রমাগত মানুষের গণতন্ত্রকে হত্যা করার পথে নেমেছে।

নন্দদুলাল দাস রাজ্য সরকারের, বিশেষ করে জেলার তৃণমূল নেতা বিধায়ক খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সুটিয়া, কামদুনির ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে বক্তব্য শুরু করলে তৃণমূলের ছাত্র নেতা উত্তম ঢালী সরাসরি মাইক্রোফোন চেপে ধরে বক্তব্য রাখতে বাধা দেয়। তখন অসংখ্য মানুষ রাস্তার ওপর ভীড় করে এগিয়ে আসে। এই ঘটনায় সকলে নিন্দা করতে থাকে। দ্রুত ঐ তৃণমূল নেতাকে মাইক্রোফোনের সামনে থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সভা চলতে থাকে। কৃষ্ণ প্রামাণিক তৃণমূল ছাত্র নেতার এই ভূমিকাকে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হিসাবে তুলে ধরেন। খাদ্য সুরক্ষা করতে হলে কৃষি জমি সুরক্ষা আইন দরকার। এলাকায় কৃষক, কৃষিমজুর, মহিলাদের সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেন। হামলার ঘটনায় সংগঠনের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ জানানো হয়।

সুবিচার ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম ঃ লক্ষ্মণপুর-বাথে

(এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ইকনোমিকাল অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলির ১৬ ডিসেম্বর সংখ্যায়। এখানে পুনঃপ্রকাশিত হল তার ভাষান্তর।)

রতনবিঘার ১৯৯৭-র ১ ডিসেম্বর ছিল সন্ত্রাসের এক দীর্ঘ রাত। বিহারের শোন নদীর তীরের দুই পাশাপাশি গ্রাম লক্ষ্মণপুর ও বাথের দলিত টোলায় ৫৮ জন দলিতকে হত্যা করে রণবীর সেনার একটি দল, যারা সামন্ত প্রভুদের সংগঠিত রাজনৈতিক মদতপুষ্ট।

ঐ রাতে ভোজপুরের দিক থেকে শোন নদী পার করে দুটি নৌকায় রণবীর সেনারা জেহানাবাদে আসে। নদীর কাছেই হত্যা করে নৌকা চালকসহ ৫ জনকে। ঐ দলটার সাথে যোগ দেয় নদীর পাড়ে অপেক্ষায় থাকা কাছাকাছি গ্রামের সেনার একটি দল। দুটো দলের প্রায় ১৫০ জন সেনা রতনবিঘায় প্রবেশ করে এবং তারা ১০ জন করে এক একটা দলে বিভক্ত হয়ে ঘরে ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা ২৭ জন মহিলা ও ১০ জন শিশু ও একটি সদ্যোজাত শিশু সহ ৫৩ জনকে হত্যা করে। যাদের খুন করা হল তাদের বেশিরভাগই ছিল দলিত এবং অতি পশ্চাদপদ শ্রেণীর, যেমন মাল্লাহ; আর কিছু ছিল অন্য পশ্চাদপদ শ্রেণীর, যেমন কৈরী।

গণহত্যার পরিকল্পনা

এই গণহত্যার পরিকল্পনার সমস্ত ছক শীঘ্রই জানা গেল। পার্শ্ববর্তী গ্রাম কামতায় ধর্ম শর্মার বাড়িতে ৩০ নভেম্বর রণবীর সেনারা একটা মিটিং করে। কামতা ও লক্ষ্মণপুর-বাথে গ্রামের রণবীর সেনারা ছাড়াও ঐ মিটিংয়ে হাজির ছিল বেলসার, চন্দা, সোহাসা, খারসা, কোয়াল, ভুপত, বসন্তপুর এবং পরশুরামপুর নামের আশপাশের গ্রামের সেনাদল।

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের ভোজপুরের কর্মীরা, যাদের ইতিমধ্যেই ১৯৯৬-এর জুলাইয়ে বাথানিটোলা গণহত্যার অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারা এই ঘনিয়ে আসা ব্যাপক গণহত্যার আভাস পেয়েছিলেন। তারা ভোজপুরে সতর্ক এবং প্রতিরোধের জন্য তৈরী ছিলেন এবং পুলিশকেও সতর্ক করেন। পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও নিষিদ্ধ রণবীর সেনাকে পুলিশ মিটিং করতে দেয়।

লক্ষ্মণপুর-বাথের পাশবিক গণহত্যার ঘটনায় শিহরিত হয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণন এই ঘটনাকে ''জাতীয় লজ্জা'' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই মামলার শুনানী পাটনা উচ্চ আদালতের আদেশে পাটনা অতিরিক্ত জেলা এবং সেশন কোর্টে শুরু হয় ২০০৯ সালের ২ জানুয়ারি, ঠিক ১১ বছর পরে। সেশন কোর্টে দিনের পর দিন শুনানীর পরে তার রায় বের হয় ২০১০ সালের ৭ এপ্রিল। ৪৫ জন অভিযুক্তদের মধ্যে ১৬ জনের ফাঁসির আদেশ ও ১০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

মামলায় প্রধান অভিযুক্ত রণবীর সেনা প্রধান ব্রহ্মেশ্বর সিং (যিনি ২০১২ সালে জামিনে মুক্ত হয়ে থাকা অবস্থায় অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা নিহত হন) সম্পর্কে প্রশাসক ও পুলিশের মনোভাব কেমন ছিল তা জানা যায় একটি ঘটনায়। বাথে গণহত্যার মামলায় তার বিচারই নাকি করা যায়নি কারণ পুলিশ প্রশাসন গল্প রটনা করে যে ব্রহ্মেশ্বর সিং 'বেপাত্তা' হওয়ায় তার তদন্ত করা যাচ্ছে না, কিন্তু ঘটনা হল যে সে তখন আরা জেলে বিগত আট বছর ধরে বন্দী ছিল!

২০১৩-র অক্টোবরে পাটনা হাইকোর্ট সেশন কোর্টের রায়কে বাতিল করে লক্ষ্মণপুর-বাথের সমস্ত অভিযুক্তদের বেকসুর খালাসের রায় দেয়। এই স্তম্ভিতকারী রায়ের আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কারণ ২০১২-র এপ্রিলে পাটনা হাইকোর্ট, ট্রায়াল কোর্টের রায়ে বাথানিটোলার সমস্ত দণ্ডিত অপরাধীদের বেকসুর খালাসের রায় দেয়। পরবর্তী ১৮ মাসে একের পর এক মামলায় যেমন মিঞাপুর, নাগারি বাজার এবং শেষে লক্ষ্মণপুর-বাথে একই ঘটনা ঘটে।

অন্যায্য খালাস

বাথানিটোলার মামলার মত বাথে মামলাতেও পাটনা উচ্চ আদালত রায়ে ধরে নেওয়া হয় প্রত্যক্ষদর্শীরা 'বিশ্বাসযোগ্যহীন'। বাথানি মামলায় উচ্চ আদালত রায় দেয় যে, গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের বেঁচে থাকার কথাই নয়। বাথের ঘটনাতে আহত প্রত্যক্ষদর্শীরা হলেন জাজ্বল্যমান প্রমাণ যে তাঁরা গণহত্যার সময় উপস্থিত ছিলেন। ঐ রায়দানের মূল কারণ ছিল প্রত্যক্ষদর্শীরা কোর্টে যে সাক্ষ্য দেন তা উচ্চতর আদালতের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি কেননা ১৯৯৭-এর ২ ডিসেম্বরের এফ আই আর, জাহানাবাদ সিভিল কোর্টে পৌঁছায় ৪ ডিসেম্বর। এতে তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান তদন্তকারী অফিসার লিপিবদ্ধ করে ২ ডিসেম্বরে যা কিনা তিনি পরীক্ষা করেননি। এদিকে কোর্টে প্রত্যক্ষদর্শীরা যে সাক্ষ্য দেন তার সাথে ২ ডিসেম্বরে তদন্তকারী অফিসারের কাছে দেওয়া লিপিবদ্ধ বয়ানের মিল নেই। আদালত এটাও বলে যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা যে সমস্ত জায়গায় আত্মগোপন করে পুলিশ সেই জায়গাগুলোও পরীক্ষা করেনি। উচ্চ আদালত সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় অপরাধীদের নাম বলতে পারেননি।

এই সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। কারণ গণহত্যার পরবর্তী সময়ে বাস্তব অবস্থা ঠিক কি ছিল তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে আদালত। কয়েকটি ঘটনার সম্ভাব্য অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে, কিন্তু উচ্চ আদালত তার মধ্যে এমন একটি ব্যাখ্যাকে বেছে নিয়েছে যেটা অপরাধীদের অনুকূলে যায়। ২ এবং ৩ ডিসেম্বর ছিল রতনবিঘায় বিশৃঙ্খল দিন। জীবিতরা মর্মাহত অবস্থায় এবং আত্মীয়বিয়োগে শোকগ্রস্ত। নিহতদের ময়না তদন্ত এবং আহতদের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জন্য ব্যস্ততা ছিল। এর ওপর ৩ ডিসেম্বরে অকুস্থলে মুখ্যমন্ত্রীর পরিদর্শনের জন্য পুলিশের ওপর ছিল অতিরিক্ত চাপ।

উচ্চ আদালত এটা বুঝতেও ব্যর্থ হয় যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা যারা সাক্ষ্য দিয়েছেন আদালতে, তারা এটা করেছেন সামাজিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে তাদের ওপর প্রভুত্বকারী শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে। সাক্ষীদের প্রবল ভীতি প্রদর্শন করা হয় যাতে তারা বিদ্বেষমূলক আচরণ করে (বস্তুত কয়েকজন সাক্ষী বিদ্রোহী হয়ে ওঠে) তবুও তারা এসব উপেক্ষা করে সাক্ষ্য দেন।

উচ্চ আদালত এটাও বলেছে যে, ভোজপুর থেকে যে সমস্ত হত্যাকারীরা এসেছিল পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি এবং ২৬ জন অভিযুক্তদের মধ্যে বেশিরভাগই হল বাথের আশেপাশের গ্রামের। কিন্তু আদালত কেন এমন ধারণা করছে যে প্রত্যক্ষদর্শীরা অসৎ উদ্দেশ্যে অভিযুক্তদের নামে সাক্ষ্য দিয়েছে? হত্যাকারীরা ভোজপুর এবং জাহানাবাদ এই দুই জায়গা থেকে এসেছিল, ১৫০ জনের মধ্যে মাত্র ৪৫ জনের নাম জানা গেছে, তার মধ্যে মাত্র ২৬ জন অভিযুক্ত হয়েছে। নিম্ন আদালতে ঐ ২৬ জনকে সন্দেহাতীতভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে অভিযুক্ত হিসাবে। এরা বাথের সংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দা। এদের জমিতেই সাক্ষীরা চাষের কাজ করেন এবং খুব ভালোভাবেই সাক্ষীরা এদের চেনেন।

বাথানিটোলা মামলার হাইকোর্টের রায়ের সম্পর্কে বেলা ভাটিয়া (২০১৩)-র অভিমত একইরকম।

লক্ষ্মণপুর-বাথে মামলার বেকসুর খালাসের রায়ের পরবর্তী সময়ে সংবাদ মাধ্যমে ''জাতপাতের যুদ্ধের পুনর্জন্ম'' এই বিষয়ে বহু রিপোর্ট এবং মতামত প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৯০-এর দশকেও বহু গণহত্যার ঘটনাকে ''জাতপাতের লড়াই'', ''শ্রেণী নির্মূলকারী যুদ্ধ'' বা ''আধিপত্যের লড়াই'', ''নকশালপন্থী'' এবং রণবীর সেনার মধ্যেকার লড়াই বলে অভিহিত করা হয়েছে। কখনও কখনও কেবলমাত্র কৃষিমজুরদের মজুরি ও জমির জন্য লড়াইও বলা হয়েছে। এ সবই হল অশুদ্ধ, অভিসন্ধিমূলক এবং বিপথে চালিত করার জন্য।

এ কোন জাতপাতের লড়াই নয়

গণহত্যাগুলোকে জাতপাতের লড়াই হিসাবে আখ্যায়িত করে সেগুলোকে ঘরোয়া সমস্যা বলে দেখানোর চেষ্টা চলছে। এই অবস্থায় বিচারের দাবিকে বর্ণনা করা হয় 'জাতপাতের উত্তেজনাকে বাড়ানোর প্রচেষ্টা' বলে। সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে 'জাতপাতের মধ্যেকার সদ্ভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিবন্ধকতা'-র কথা বলা হয়েছে। আরেকটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'সি পি আই (এম এল)-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর সাম্প্রতিক লক্ষ্মণপুর-বাথে পরিদর্শনে এসে সেখানকার জাতপাতের উত্তেজনাকে সমর্থন করেছেন'।

'জাতপাতের সদ্ভাব' শব্দটি কোন ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু এটা একটা চালাকি। রণবীর সেনা প্রধান ব্রহ্মেশ্বর সিং-এর ভাষায়, 'সি পি আই (এম এল) আমাদের সমাজের জাতপাতের শৃঙ্খলা ভেঙেছে, সদ্ভাব নষ্ট করেছে'। তার নিহত হওয়ার আগের দিন সে এক সাক্ষাৎকারে বলে, 'শান্তি, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য হিংসা কোন পাপ নয়'। রণবীর সেনার এই 'সামাজিক ঐক্যের' মতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ-ভারতীয় জনতা পার্টির 'সামাজিক সমরাস্তা'-র শ্লোগান, যার অন্তর্বস্তু হল নিপীড়িত জাতের দমন, এই দুই মতের মিল কোন সমাপতন নয়। এই নিপীড়িত জাতের দলিতরা যখনই খুবই তুচ্ছ সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা রাজনৈতিক কারণে মাথা তোলেন তখনই শৃঙ্খলাভঙ্গের বদনামে তাকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য শৃঙ্খলারক্ষার নামে গণহত্যা ঘটিয়ে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বলা হয়।

শক্তিক্ষয়ী লড়াই বা নকশালপন্থীদের অর্থনৈতিক অবরোধ—যেগুলোকে গণহত্যার জন্য দায়ী বলা হয়—সেগুলো আসলে কি? বাথে গণহত্যার জন্য তো সেরকম কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংঘাত ছিল না। ঐ গ্রামটিও সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের বা পূর্বতন সি পি আই (এম এল) পার্টি ইউনিটির শক্ত ঘাঁটি ছিল না। যদিও ঐ গ্রামে উভয় পার্টির কিছু কিছু সদস্য ছিল। কিন্তু গ্রামে কোনও অস্ত্র ছিল না। মজুরি এবং জমি নিয়ে কিছু আন্দোলনও হয়েছিল, কিন্তু তার থেকেও তীব্র সংগ্রাম হয়েছিল অন্যান্য গ্রামে। কিন্তু বাথেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল 'নরম লক্ষ্যবস্তু' হিসাবে। যদিও জাতপাত এবং শ্রেণী একটা কারণ, কিন্তু রাজনৈতিক কারণই প্রধান ছিল। নির্বাচনের প্রাক্কালে বিজেপির প্রয়োজন ছিল উচ্চবর্ণের সংহতি ও সমর্থনের, তাই ''রেকর্ড ভেঙ্গে দেওয়া'' শিহরণ জাগানো ঐ গণহত্যার প্রয়োজন হয়েছিল।

রণবীর সেনা পূর্বেকার অন্যান্য সেনাদের থেকে বিশেষভাবে আলাদা ছিল। ঐ অঞ্চলে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের নির্বাচক ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উত্থানকে প্রতিহত করার জন্য রণবীর সেনা তৈরী করা হয়েছিল। আগেকার সেনারা ছিল একেবারেই স্থানীয় ভিত্তিক। রণবীর সেনার ব্যাপ্তি ছিল মধ্য বিহার জুড়ে। রণবীর সেনা অন্যান্য সেনাদের থেকে মতাদর্শগতভাবে ঐক্যবদ্ধ ছিল এবং সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছে। সেনারা ঘোষিতভাবে আর এস এস-এর মতাবলম্বী ছিল এবং নির্বাচনের সময় বিজেপির হয়ে লিফলেট বিলি করত। রণবীর সেনা বহু রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সহায়তা, এমনকি বিশ্বের বহু আর্থিক উৎসেরও অনুদান পেত।

লালুপ্রসাদ রণবীর সেনা সমর্থকদের সঙ্গে একই মঞ্চে ওঠাবসা করতেন এবং এর জন্য তাঁর কোনও অনুতাপ ছিল না। লালু বলতেন, 'সি পি আই (এম এল)-কে ঠেকানোর জন্য শয়তানের সাথেও হাত মেলাব'। এটাই ব্যাখ্যা করে কেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আর জে ডি) শাসনের সময় নিষিদ্ধ সেনাদের দ্বারা এতগুলো গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে ও তারা রেহাই পেয়ে গেছে। বিজেপি সমর্থিত রণবীর সেনার সাথে আর জে ডি, জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং জে ডি (ইউ)-র আপসের একটাই উত্তর তা হল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত শক্তি ও উদীয়মান কুলাক শ্রেণী, যারা উচ্চবর্ণের নেতৃত্বের দুই গোষ্ঠী থেকে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে অভ্রান্তভাবে সংযুক্ত হয়েছে প্রবল প্রাধান্য বিস্তারকারী পশ্চাদপদ দলিত শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ উত্থানের জন্য।

বাথানিটোলা এবং বাথে গণহত্যার পর যে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় ওঠে তার ফলে আর জে ডি সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারক আমীর দাসের নেতৃত্বে রণবীর সেনার রাজনৈতিক মদতদাতাদের অনুসন্ধানের জন্য কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। বিচারক আমীর দাস বলেছেন তাঁকে প্রাথমিক পরিকাঠামো দেওয়া হয়নি এবং তদন্তের কাজ ধ্বংস করার প্রচেষ্টাও হয়েছে। রণবীর সেনার দ্বারা সংঘটিত মোট ৩৪টি গণহত্যার অনুসন্ধান করা হয়। নিষিদ্ধ রণবীর সেনাকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া এবং তার পরিবর্তে কি কি রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়া গেছে সেনাদের থেকে এই সম্পর্কে যে কয়জন রাজনৈতিক নেতাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তার মধ্যে অনেক প্রবীণ বিজেপি, জে ডি (ইউ) এমনকি আর জে ডি এবং কংগ্রেস নেতাও রয়েছেন।

২০০৬-এ নীতীশকুমার সরকার গঠনের পর প্রথম যে কাজ করেছিল তা হল আমীর দাস কমিশনকে বাতিল করা। কমিশন তখন তার রিপোর্টের শেষ অধ্যায়ের কাজ প্রায় গুটিয়ে এনেছিল। এটা করা হল কারণ কমিশনের রিপোর্টের ফলে অনেক বিজেপি এবং জে ডি (ইউ)-র সামনের সারির নেতার নাম উদ্ঘাটিত হত।

এটা দাবি করা হয় যে নীতীশ কুমার নাকি বিহারে বহুল চর্চিত 'জাতপাতের যুদ্ধ'-কে বদলে দিয়েছেন উন্নয়নের জোয়ারে। এটা হল সম্পূর্ণত বদমাইশি, কারণ এই সরকার রণবীর সেনা ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের গোষ্ঠীর দ্বারা দলিতদের ওপর প্রতিহিংসামূলক হিংসার অনুমোদন দিয়েছে, এমনকি তার সরকারের বন্দ্যোপাধ্যায় কমিশনের ভূমি সংস্কারের অত্যন্ত বিনম্র প্রস্তাবকেও নীতীশকুমার বানচাল করেছেন। ভোজপুরের তরারিতে রণবীর সেনার নেতা সুনীল পাণ্ডে জে ডি (ইউ)-র বিধায়ক হিসাবে আজও বহাল আছে।

ন্যায়বিচার প্রতিশোধ নয়

অনেক নামী সাংবাদিক সাবধান করছেন এই বলে যে, বিচার ব্যবস্থা যদি গণহত্যাগুলোর বিচার দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে গরিবদের প্রতিহিংসা নিতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, বিচারের প্রশ্নের সাথে অন্যায়ের শোধ তোলা বা পুরোনো ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়া নয়। এটা বর্তমানে গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত। বাথে এবং বাথানিটোলার রিক্ত মানুষদের কাছে বিচারের প্রশ্নের সাথে জড়িয়ে রয়েছে তাদের সামাজিক মর্যাদা, প্রকৃত গণতন্ত্র এবং সামন্ত শক্তি ও সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিরোধের সংগ্রামের প্রশ্ন।

ব্রহ্মেশ্বর সিং নিহত হওয়ার কয়েকদিন আগে একটি টিভি চ্যানেলে সাক্ষাৎকারের সময় বলেন যে, তিনি ছেলেবেলা থেকেই আর এস এস কর্মী এবং তিনি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চান। ১৯৯৪-তে তিনি দলিতদের জন্মের আগেই অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় তাদের হত্যা করার কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ''... বিষধর সাপের ডিম ফুটে যে সাপ জন্ম নেবে তা তোমাকেই একদিন দংশন করবে। সুতরাং ডিমকে গুঁড়িয়ে দেওয়া কোন অপরাধ নয়।'' বাথানিটোলায় রিক্ত মানুষ, পশ্চাদপদ মুসলমান এবং দলিতরাই নিহত হয়।

বাথে গণহত্যার পরিণামে সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক বিনোদ মিশ্র লিখেছিলেন, ''বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম এবং গেরুয়া সেনাদের আক্রমণকে রুখে দেওয়ার যে জাতীয় দায়িত্ব পালনের স্বার্থ—উভয়েই কেন্দ্রীভূত হয়েছে রণবীর সেনাকে উৎখাতের এক এবং একমাত্র কর্তব্যের মধ্যে।'' ভূমিহীন দরিদ্রদের গণহত্যাগুলোর বিচারের দাবিও তাই দেশজুড়ে গেরুয়া বাহিনীর আক্রমণকে প্রতিহত করার কর্তব্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

- কবিতা কৃষ্ণাণ

সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে সভা

কলকাতা হাজরা মোড়ে বক্তব্য রাখছেন পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক অমিত দাশগুপ্ত।

গত ৬ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদ কলকাতার হাজরা মোড়ে কর্পোরেট সহযোগী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাসী সভার আয়োজন করে। প্রথমেই যুগ্ম সম্পাদক অমিত দাশগুপ্ত আজকে ২১ বছর পরে আবারও কেন সাম্প্রদায়িক কর্পোরেট শক্তির বিরুদ্ধে এই সমাবেশ করতে হচ্ছে তার মুখবন্ধ করেন। তারপর নৈহাটির ''অগ্নিবীণা''র গানে সভাস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে। এই সাংস্কৃতিক সমাবেশে বাবুনি মজুমদার, নীতীশ রায়, প্রণব মুখার্জী, জ্যোতি ভট্টাচার্য এবং বজবজ ''চলার পথে'' গান ও কবিতা পরিবেশন করেন। শিল্পীরা প্রত্যেকেই নতুন করে যে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরুত্থান ঘটছে তার বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে অনুরোধ করেন।

এছাড়া যারা এই সাংস্কৃতিক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পি ইউ সি এল-এর অম্লান ভট্টাচার্য, অধ্যাপক সলিল বিশ্বাস, কাজী মাসুম আখতার, সি পি আই (এম এল) কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী এবং রাজ্য কমিটি সদস্যা ইন্দ্রাণী দত্ত।

বক্তারা প্রত্যেকেই বারবার করে কর্পোরেট সহযোগী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী শক্তি নরেন্দ্র মোদীর এই উত্থান সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করেন। গানে কবিতায় এবং বক্তব্যে এই সমাবেশ আওয়াজ তোলে আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই।

আইসা'র প্রথম বালি-কোন্নগর আঞ্চলিক সম্মেলন

প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু কর্মসূচী ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচারের ফলাফলে হাওড়ার বালি থেকে হুগলীর কোন্নগর পর্যন্ত তৈরী হয়েছে অল ইণ্ডিয়া স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের কাজের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনাকে পূর্ণ সাংগঠনিক রূপ দিতে এবং সংগ্রামী বাম ছাত্র আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করতে ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ কোন্নগরে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ আই এস এ-র রাজ্য সম্পাদক রণজয়। এছাড়াও সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ, প্রগতিশীল মহিলা সমিতি এবং এ আই সি সি টি ইউ-র প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁদের বক্তব্যে আগামীদিনে কাজের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য ছাত্র সংগঠন ও সামগ্রিক পার্টি কাঠামোর সংযোগের ওপর জোর দেন। আইসা রাজ্য সম্পাদক রণজয় অতীত ও বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আগামীদিনে আইসার কাজের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান রাখেন। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি নেতৃত্বকারী কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন ছাত্র সংগঠক নীলাশিস, আর সভাপতি সৌরভ। আগামীদিনে এতদঞ্চলে সংগ্রামী বাম ছাত্র সংগঠন হিসেবে উঠে আসার শপথ নিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাজ্যে পার্টির সংকল্প দিবস উদ্‌যাপন

১৮ ডিসেম্বর সি পি আই (এম এল)লিবারেশনের সংকল্প দিবসে প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড বিনোদ মিশ্রের ১৫ তম ও কমরেড শংকর মিত্রের প্রথম স্মরণ বার্ষিকী উদ্‌যাপন হয় রাজ্যের জেলায় জেলায়। কলকাতায় পার্টির রাজ্য অফিসের সামনে প্রতিষ্ঠিত শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য বর্ষীয়ান কমরেড অমলেন্দুভূষণ চৌধুরী, কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড ধীরেশ গোস্বামী, রাজ্য কমিটি সদস্য কমরেড জয়তু দেশমুখ, কমরেড ইন্দ্রাণী দত্ত, কলকাতা জেলা কমিটি সদস্য কমরেড অমিত দাশগুপ্ত, প্রবীর দাস, রাজ্য অফিসের পার্টি সদস্য কমরেড সুরেশ মন্ডল, দেশব্রতী পত্রিকার পার্টি সদস্য কমরেড অরূপ পাল ও বাবলু দাস। এছাড়া কলকাতার কলেজ স্কোয়ার, বেহালার কালীতলা-মুচিপাড়া, যাদবপুর, ঢাকুরিয়া শহীদনগর পার্টি অফিস ও বাঁশদ্রোণীতে সংকল্প দিবস উদ্‌যাপন করা হয় শ্রদ্ধা নিবেদন করে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয় পার্টি ব্রাঞ্চের বৈঠক সংগঠিত করে। তাছাড়া বেলঘড়িয়ায় পার্টি অফিসের সামনে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য কমরেড নবেন্দু দাশগুপ্ত সহ ঐ অঞ্চলের কমরেড হিমাংশু বিশ্বাস, সুব্রত ভৌমিক, ভোলানাথ গুহ রায়, বিষ্ণু রায় প্রমুখ। হুগলি জেলার চুঁচুড়া, কোন্নগর ভদ্রেশ্বর, দাদপুর, বলাগড়, গুপ্তিপাড়া, ইছাপুর অঞ্চলে কর্মীসভার মধ্য দিয়ে সংকল্প দিবস পালন করা হয়। হাওড়া জেলায় সংকল্প দিবসের কর্মসূচী পালিত হয় বালি, মধ্য হাওড়া, আরুপাড়া, বাঙ্গালপুর, হাটুরিয়া অঞ্চলে। নদীয়া জেলায় সংকল্প দিবসের কর্মীসভা হয় কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, নাকাশীপাড়া, চাপড়া, পলাশীপাড়া ও নবদ্বীপে।

অন্যান্য জেলায়ও সংকল্প দিবসের কর্মসূচী উদ্‌যাপিত হয়।

প্রগতিশীল মহিলা সমিতির ৬ষ্ঠ কলকাতা জেলা সম্মেলন সফল হল

নারীর নির্ভয় স্বাধীনতা, মর্যাদা, কাজের অধিকার ও গণতন্ত্রের দাবিতে সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির ৬ষ্ঠ কলকাতা জেলা সম্মেলন ১৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল কলকাতার যাদবপুরের শহীদনগর বিদ্যাপীঠ স্কুলে। পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন জেলা কমিটির সদস্যা শুক্লা সেন। সম্মেলন কক্ষে প্রতিনিধিদের নিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। কক্ষটি বিভিন্ন পোস্টারে সুসজ্জিত ছিল। সম্মেলনের সভাগৃহ মহিলা সমিতির সদস্যা শ্রাবণী মিত্রের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। ৩ জনের সভাপতিমণ্ডলী তৈরী হয়।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন রাজ্য সম্পাদিকা চৈতালী সেন। তিনি বলেন, গতবছর ১৬ ডিসেম্বর দিল্লীতে নির্ভয়ার আন্দোলনে ছাত্র, যুব, মহিলাদের অংশগ্রহণের আঁচ এসে পড়ে কলকাতায়। আরও বিভিন্ন শহরে মহিলাদের নির্ভয় স্বাধীনতার আন্দোলন আজও অব্যাহত আছে। আশারাম বাপুর মতো নীতিবাগীশ লোকেরাও আজ নারী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত। নির্ভয় আন্দোলনের সঙ্গে নির্ভয় বাঁচার অধিকার মহিলারা অর্জন করছে। ৩৭৭ ধারা বাতিল করার দাবিও তিনি তোলেন এবং স্পষ্ট করেন যে সমকামী হওয়ার অধিকার মানুষের আছে।

এরপর বিদায়ী সম্পাদিকা প্রতিবেদন পেশ করেন। ১০ জনের মতো প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন, তাদের মধ্যে নোনাডাঙার মহিলা সম্মেলনে বলেন তিনি কিভাবে বামফ্রন্টের আমলে উচ্ছেদ হয়ে নোনাডাঙায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভেবেছিলেন যে পরিবর্তন হলে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে, তাই তাঁরা তৃণমূলের ওপর আস্থা রেখেছিলেন। আজ তাঁরা বুঝেছেন যে তাঁদের অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। এই সরকার তাদের উচ্ছেদ করছে ও এই অঞ্চলে দুষ্কৃতিদের অত্যাচারও বেড়ে চলেছে। তারা কেউ নিরাপদ নয়। প্রতিনিধিদের মধ্য নোনাডাঙার কৃষ্ণা সিং ও বেহালার শীলা নস্কর বলেন যে কিভাবে নিজেদের জমির অধিকার থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন তাঁরা। শ্রমজীবী মহিলারা ছাড়া সম্মেলনে ছাত্রীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন, উজ্জয়িনী তাদের মধ্যে একজন। তার বক্তব্যে উঠে আসে শিশুরা পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে পুরুষ বা মহিলা হিসেবে বড় হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে সে গড়ে ওঠে না, আর এখানেই সমস্যার মূল লুকিয়ে আছে। প্রতিবেদনের উল্লিখিত সাংগঠনিক বিষয়ে সহমত পোষণ করে সাথী কস্তুরি বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল)-এর জেলা সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী। তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়িতে মহিলাদের যে ভূমিকা ছিল তা তিনি তুলে ধরেন। পরিচারিকাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সভাপতি অতনু চক্রবর্তী। নাগরিক সমন্বয়ের অমলেন্দু ভূষণ চৌধুরী বক্তব্যের মধ্যে স্থানীয় পরিচারিকাকে অত্যাচার করার ঘটনার উদাহরণ দিয়ে বক্তব্য রাখেন। এ আই এস এ-র তনিমা তুলে ধরেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে যে যৌন হেনস্থা করা হয়েছিল, এর বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলনের কথা। কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'জেণ্ডার সেন্সিটাইজেসান' সেল গড়ে তোলার দাবি করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করার দাবিও করেন যাতে উচ্চশিক্ষায় মহিলারা সুযোগ করে নিতে পারে।

মহিলাদের ওপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ও মহিলা শ্রমিকদের অধিকারের দাবিকে সামনে রেখে গণভিত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী দিনে সংগঠন কাজ গড়ে তুলবে। সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে ১৭ জনের কাউন্সিল গঠন হয় এবং ৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়। ইন্দ্রাণী দত্ত জেলা সভাপতি ও চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। উদ্দীপনা ও উৎসাহের সঙ্গে সম্মেলন সম্পন্ন হয়।

কলকাতা মহিলা সম্মেলনে প্রতিবেদন পেশ করছেন জেলা সম্পাদিকা ইন্দ্রাণী দত্ত।

''ফোরাম ফর পিপলস্ হেল্‌থ''-এর আহ্বানে

কনভেনশন

''জীবন ও জীবিকার স্বার্থে পরিবেশ বাঁচাও''

৪ জানুয়ারি, ২০১৪, বিকাল ৩টা

রামমোহন মঞ্চ (মানিকতলা মোড়-এর কাছে) কলকাতা

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ও ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com